আমের আধুনিক চাষাবাদ ও বিপণন কৌশল

আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.bari.gov.bd

Publication No. bklt-01/2015-16

আমের আধুনিক চাষাবাদ ও বিপণন কৌশল

রচনায়

ড. মো. শরফ উদ্দিন
ড. মো. শফিকুল ইসলাম
ড. মো. জমির উদ্দিন
মো. আশরাফুল আলম
মো. মোশাররফ হোসেন
মো. হারুন অর রশীদ

সম্পাদনায়

ড. মো. রফিকুল ইসলাম মন্ডল
ড. ভাগ্য রানী বণিক
মো. হাসান হাফিজুর রহমান

আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

প্রকাশ কাল
আগস্ট ২০১৫
১০০০ কপি

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

ডিজাইন
মো. মফিজুল ইসলাম
মো. খায়রুল হাসান

মুদ্রণে
বেঙ্গল কম-প্রিন্ট
৬৮/৫, গ্রীন রোড, পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫
ফোন: ০১৭১৩০০৯৩৬৫, ০১৯৭৩০০৯৩৬৫৪

প্রাক্‌কথন

আম (Mangifera indica L.) Anacardiaceae পরিবারের অন্যতম প্রধান ফল। পৃথিবীতে আমের ইতিহাস অনেক প্রাচীন এবং বর্তমানে ১০০টি দেশে আমের বাণিজ্যিক চাষাবাদ হচ্ছে। আমের উৎপত্তি ভারতীয় উপমহাদেশে। পূর্ব এশিয়ায় আমের প্রচলন হয় খ্রীষ্ট পূর্ব ৪র্থ থেকে ৫ম শতাব্দীতে। বাংলাদেশে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহী জেলায় ব্যাপকভাবে আমের চাষাবাদ ও উৎপাদন হয়ে থাকে। বিবিএস এর তথ্য মতে ২০১৪ সালে বাংলাদেশে ৭০ হাজার হেক্টর জমিতে আমের চাষাবাদ হয় এবং মোট উৎপাদন ৯.৫ লক্ষ মেট্রিক টন। যদিও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাব মতে জমির পরিমাণ ও উৎপাদন আরও বেশি। আমাদের দেশে আমের ফলন বেশ কম, হেক্টর প্রতি মাত্র ৪ টন। প্রতিবেশি দেশ ভারতে এর ফলন হেক্টর প্রতি প্রায় ১০ টন। ফলন কম হওয়ার অন্যতম কারণ হলো উন্নত জাত, আধুনিক চাষাবাদ, রোগবালাই দমন এবং গাছের পরিচর্যার অভাব। অন্যান্য মাঠ ফসলের তুলনায় আমের আবাদ লাভজনক। দিনদিন আম রপ্তানির সুযোগ বাড়ছে। এখন আমের বাগানের ভিতরে অন্যান্য ফসল ফলানো সম্ভব হচ্ছে। ভালো জাত রোপণ, রোগ বালাই দমন এবং পরিচর্যা করলে আম উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। বিএআরআই এখন পর্যন্ত আমের হাইব্রিডসহ ১১টি উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছে। এই পুস্তকে যার সবক'টি জাতের বর্ণনা, রোপণ পদ্ধতি, রোগ বালাই দমন ও পরিচর্যা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

আমি আশা করি, পুস্তকটি প্রকাশের উদ্দেশ্য সফল হবে। পুস্তকটি প্রণয়নে যে সব বিজ্ঞানী অবদান রেখেছেন তাদেরকে আমার অভিনন্দন। সম্পাদনার সাথে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

ড. ভাগ্য রানী বণিক
পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ)

মুখবন্ধ

স্বাদ, গন্ধ ও পুষ্টিমান বিবেচনায় আম আমাদের দেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় ফল। এ কারণে আমাদের দেশে আমকে ফলের রাজা বলা হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে ৯.৫ লক্ষ মেট্রিক টন আম উৎপন্ন হয়। উন্নত জাতের আবাদ, উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি ও পরিচর্যার মাধ্যমে আমের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি করার সুযোগ আছে। প্রতিদিন একজন মানুষের ৮৫ গ্রাম ফল খাওয়ার প্রয়োজন থাকলেও আমরা ৩০-৩৫ গ্রামের অধিক ফল খেতে পারি না। আম পুষ্টিমানে সমৃদ্ধ ফল। পাকা ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যারোটিন রয়েছে। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভিটামিন বি, সি এবং খনিজ উপাদান আছে। কাঁচা আমে পাকা আমের তুলনায় দেড়গুন ভিটামিন সি থাকে। আমের আছে নানাবিধ ঔষধি গুণ। আমের রয়েছে বহুবিধ ব্যবহার। আম থেকে আচার, চাটনি, আমসত্ব, মোরব্বা, স্কোয়াশ, সিরাপ, সরবত ইত্যাদি তৈরি করা যায়। আমের প্যাকেটজাত রস (ম্যাংগো জুস) দেশে বিদেশে সমান জনপ্রিয়। আয়-ব্যয় হিসেবে অন্যান্য মাঠ ফসলের তুলনায় আমের আবাদ অত্যন্ত লাভজনক। বর্তমানে বিদেশে আম রপ্তানির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে আম আরও অধিক গুরত্বপূর্ণ হতে পারে।

বর্তমানে সরকার আম গাছকে জাতীয় বৃক্ষ হিসেবে ঘোষণার মাধ্যমে আমের গুরত্বকেই বস্তুতপক্ষে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট তার উদ্যানতত্ত্ব গবেষণার আওতায় ফলটিকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে গবেষণা করে আসছে। এ পর্যন্ত বিএআরআই কর্তৃপক্ষ আমের ১১টি উন্নত জাত অবমুক্ত করেছে। যার সবগুলো জাত কম বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

আম চাষের ক্ষেত্রে বর্তমান পুস্তকটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ বলা যেতে পারে। যেখানে বিএআরআই উদ্ভাবিত জাতসমূহের ছবিসহ বর্ণনা, চাষাবাদ পদ্ধতি, রোগবালাই এর পরিচিতি, বিস্তার ও রোধকল্পে করণীয় সর্ম্পকে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। আম গাছের পরিচর্যার বিষয়টিকেও গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়েছে। আমি আশা করি, এ পুস্তকটি আম উৎপাদনকারীদের যথেষ্ট উপকারে আসবে এবং আমের কাঙ্খিত ফলন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। পুস্তকটি প্রকাশের উদ্দেশ্য সফল হোক এই কামনা করছি। রচয়িতা ও সম্পাদকবৃন্দকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

ড. মো. রফিকুল ইসলাম মন্ডল
মহাপরিচালক

ভূমিকা

বাংলাদেশ মৌসুমী ফলের দেশ। এখানে নানান স্বাদের ও বর্ণের বিভিন্ন প্রকারের ফল জন্মে। আম বাংলাদেশের একটি অতি জনপ্রিয় ও সুস্বাদু ফল। বর্ণ ও গন্ধে এই ফল অতুলনীয়। আমের যেমন অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে তেমনি এর সামাজিক তাৎপর্যও সুবেদিত। আম (Mangifera indica L.) Anacardiaceae পরিবারের অন্যতম প্রধান ফল। পৃথিবীতে আমের ইতিহাস অনেক প্রাচীন এবং বর্তমানে ১০০ টি দেশে আমের বাণিজ্যিক চাষাবাদ হচ্ছে। আমের উৎপত্তি ভারতীয় উপমহাদেশে। পূর্ব এশিয়ায় আমের প্রচলন হয় খ্রীষ্ট পূর্ব ৪র্থ থেকে ৫ম শতাব্দীতে। আমকে ইংরেজি ও স্প্যানিস ভাষায় 'mango', মালয় ভাষায় 'mangga' এবং পর্তুগীজ ভাষায় 'manga' বলা হয়। বাংলাদেশে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহী জেলায় ব্যাপকভাবে আমের চাষাবাদ ও উৎপাদন হয়ে থাকে। এছাড়াও সারা দেশে আমের কম বেশি উৎপাদন হয়। বিবিএস এর তথ্য মতে ২০১৪ সালে বাংলাদেশে ৭০ হাজার হেক্টর জমিতে আমের চাষাবাদ হয় এবং মোট উৎপাদন ৯.৫ লক্ষ মেট্রিক টন। যদিও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাব মতে জমির পরিমাণ ও উৎপাদন আরও বেশি। আমাদের দেশে আমের ফলন বেশ কম, হেক্টর প্রতি মাত্র ৪ টন। প্রতিবেশি দেশ ভারতে এর ফলন হেক্টর প্রতি প্রায় ১০ টন। ফলন কম হওয়ার অন্যতম কারণ হলো উন্নত জাত, আধুনিক চাষাবাদ, রোগবালাই দমন এবং গাছের পরিচর্যার অভাব। অন্যান্য মাঠ ফসলের তুলনায় আমের আবাদ লাভজনক। দিনদিন আম রপ্তানির সুযোগ বাড়ছে। এখন আমের বাগানের ভিতরে অন্যান্য ফসল ফলানো সম্ভব হচ্ছে। ভালো জাত রোপণ, রোগ বালাই দমন এবং পরিচর্যা করলে আম উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। বিএআরআই এখন পর্যন্ত আমের হাইব্রিডসহ ১১টি জাত উদ্ভাবন করেছে। সবকটি জাতের বর্ণনা, রোপণ পদ্ধতি, রোগ বালাই দমন ও পরিচর্যা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

বারি আম-১ (মহানন্দা)

'বারি আম-১' প্রতি বছর ফলধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি জাত। আমের এই আগাম জাতটি বাংলাদেশে চাষ করার জন্য ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। গাছের আকৃতি মাঝারী। পাতার আকৃতি লম্বাটে।

পুষ্পমঞ্জরীর আকৃতি পিরামিডের মত। ফল প্রায় গোলাকার। ফলের গড় আকার দৈর্ঘ্য ৭.৬ সেমি, প্রস্থ ৬.৭ সেমি, পুরুত্ব ৫.৯ সেমি। পাকা ফলের রঙ আকর্ষণীয় হলদে। ফলের ওজন ১৯০-২১০ গ্রাম। ফলের শাঁস গাঢ় হলদে, সুগন্ধযুক্ত, মধ্যম রসালো, আঁশহীন ও মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১৯%) এবং শাঁস ফলের ৭০%। ফলের খোসা পাতলা ও মসৃণ।

প্রতি বছর নিয়মিত ফল দেয়। মাঘ মাসে (মধ্য জানুয়ারি-মধ্য ফেব্রুয়ারি) গাছে ফুল আসে। ফল আহরণের সময় জ্যৈষ্ঠ মাসের ২য় সপ্তাহ (মে মাসের শেষ সপ্তাহ)। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৭০০-৮০০টি। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৫ টন। বাংলাদেশে সর্বত্রই মহানন্দা চাষ করা যায়। তবে ফলের বোঁটা শক্ত ও ঝড়ো হাওয়া সহনশীল বিধায় দেশের পূর্বাঞ্চলের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। মহানন্দা রপ্তানিযোগ্য জাত বলে এর বাগান করে বেশি লাভবান হওয়া যায়।

বারি আম-২

'বারি আম-২' প্রতি বছর ফলধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন রঙিন উচ্চ ফলনশীল জাত। দেশের ভিতর থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজমের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জাতটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষের জন্য ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। এ জাতের আম দেখতে খুবই আকর্ষণীয়, ত্বকের রঙ গাঢ় হলদে। এ জাতের আম কেটে ফালি করে খাওয়া যায়। বারি আম-২ জাতটি মাঝ-মৌসুমী। ফুল আসার সময় ফাল্গুনের ১ম সপ্তাহ (মধ্য-ফেব্রুয়ারি)। ফল আহরণের সময় আষাঢ়ের ১ম সপ্তাহ (জুনের ৩য় সপ্তাহ)।

ফলের আকৃতি উপবৃত্তাকার। ফলের গড় আকার দৈর্ঘ্য ৯.৭৫ সেমি, প্রস্থ ৭.২৫ সেমি এবং পুরুত্ব ৬.১০ সেমি। ফলের ওজন ২৪০-২৬০ গ্রাম। ফলের শাঁস গাঢ় হলদে, মধ্যম রসালো, আঁশহীন ও কম মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১৭.৫০%) এবং শাঁস ফলের ৬৯%। ফলের খোসা মধ্যম পুরু ও মসৃণ। হেক্টরপ্রতি ফলন ২২ টন। জাতটি বাংলাদেশে সর্বত্রই চাষের উপযোগী। এটি একটি রপ্তানিযোগ্য জাত।

বারি আম-৩ (আম্রপালি)

'বারি আম-৩' দেশের আম জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবর্তন। বিদেশ থেকে সংগৃহীত জাতটি বাংলাদেশের জলবায়ুতে উপযোগিতা যাচাইয়ের পর চাষের জন্য ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়।

গাছ তুলনামূলকভাবে খাটো ও খাড়া। পুষ্পমঞ্জরীর আকৃতি পিরামিডের মত। ফল লম্বাটে ডিম্বাকৃতির হয়। ফলের গড় আকৃতি দৈর্ঘ্য ৮.৩ সেমি, প্রস্থ ৬.০ সেমি এবং পুরুত্ব ৫.৮ সেমি। পাকলে হলুদাভ সবুজ রঙ ধারণ করে। ফলের ওজন ২১০-২২০ গ্রাম। ফলের শাঁস গাঢ় কমলা রঙের হয়। ফল পাকলে সুস্বাদু, সুগন্ধযুক্ত বেশ মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২৩.৪০%) হয়। আঁশহীন, মধ্যম রসালো, শাঁস ফলের ৭১%। ফলের খোসা মধ্যম পুরু ও মসৃণ।

প্রতি বছর ফলদানকারী নাবী জাত। ফুল আসে ফাল্গুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে (ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ), ফল আহরণের সময় আষাঢ়ের ৩য় সপ্তাহ (জুলাইয়ের ১ম সপ্তাহ)। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০ টন। জাতটি বাংলাদেশের সব এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে চাষের উপযোগী।

বারি আম-৪ (হাইব্রিড আম)

দীর্ঘদিন চেষ্টা করে সংকরায়ণের মাধ্যমে 'বারি আম-৪' নামে একটি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ হাইব্রিড জাতটি উদ্ভাবনে ফ্লোরিডার এম-৩৮৯৬ জাতটিকে পুরুষ ও দেশীয় আশ্বিনা জাতটি স্ত্রী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। জাতটি জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য ২০০৩ সালে অনুমোদন লাভ করে।

এটি নিয়মিত ফলদানকারী একটি উচ্চ ফলনশীল, মিষ্টি স্বাদের নাবী জাত। ফজলী আম শেষ হওয়ার পর এবং আশ্বিনা আমের সাথে অর্থাৎ মধ্য শ্রাবণ থেকে শ্রাবণের শেষে (জুলাই শেষ সপ্তাহ থেকে আগস্ট ১ম সপ্তাহ) এ জাতের আম পাকে। আশ্বিনা আম বড় হলেও খেতে টক ভাবাপন্ন বিধায় তেমন কদর নেই। অথচ বারি আম-৪ এর ফল আকারে বেশ বড় (৬০০ গ্রাম), প্রায় গোলাকৃতি, শাঁস হলদে, খেতে খুব

মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২৪.৫%)। এ জাতের আম কাঁচা অবস্থাতেও খেতে মিষ্টি। আমের শাঁস দৃঢ় হওয়ায় পাকার পরও বেশ কয়েকদিন ঘরে সংরক্ষণ করা সম্ভব। ফলের শাঁস গাঢ় হলদে বর্ণের, আঁশহীন ও রসালো। আঁটি ছোট ও খোসা পাতলা, শাঁস ফলের ৮০%। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০ টন। জাতটি বাংলাদেশের সব এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে চাষের উপযোগী।

বারি আম-৫

দেশের ভিতর থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জাতটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষের জন্য ২০১০ সালে 'বারি আম-৫' নামে অনুমোদন করা হয়। এটি নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল আগাম জাত। আমের বাণিজ্যিক জাত গোপালভোগেরও আগে পাকে। আমের আহরণ মৌসুম দীর্ঘায়িত করতে জাতটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

গাছ বড় ও খাড়া। ফাল্গুন মাসে গাছে মুকুল আসে এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিকে (মে মাসের ৩য় সপ্তাহ) ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল মাঝারী (২৩০ গ্রাম), ডিম্বাকার, উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের ও খেতে মিষ্টি (১৯% ব্রিক্সমান), খাদ্যোপযোগী অংশ ৭০%। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৫-২০ টন। জাতটি রপ্তানিযোগ্য।

বারি আম-৬

'বারি আম-৬' বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনটিস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি মধ্য-মৌসুমী জাত। প্রদর্শণীর মাধ্যমে সংগ্রহ করে নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে ২০১০ সালে জাতটি অবমুক্ত করা হয়। এটি নিয়মিত ফলধারী একটি সুস্বাদু ও উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ মধ্যম আকৃতির ও মধ্যম খাড়া।

ফাল্গুন মাসে গাছে মুকুল আসে এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল লম্বাটে ডিম্বাকৃতির, মধ্যম আকারের, গড় ওজন-২৮০ গ্রাম, লম্বায় ৯.৯ সেমি ও প্রস্থে ৯.৫ সেমি, পুরুত্বে ১১.৩ সেমি, পাকা ফলের রঙ হলুদাভ সবুজ, চামড়া পাতলা ও শাঁসের রঙ হলুদ, স্বাদে মিষ্টি (টিএসএস ২১%), শাঁস আঁশবিহীন, আঁটির ওজন ৪০ গ্রাম, খোসার ওজন ৪২ গ্রাম, ভক্ষণযোগ্য অংশ ৭২% এবং সংরক্ষণ ক্ষমতা ভাল। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৬ টন।

বারি আম-৭

'বারি আম-৭' বিএআরআই উদ্ভাবিত একটি রঙিন মাঝ মৌসুমী জাত। স্থানীয় জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচন করে ২০১০ সালে জাতটি অবমুক্ত করা হয়। এটি সুস্বাদু, উচ্চ ফলনশীল ও নিয়মিত ফলধারী জাত। অত্যন্ত আকর্ষণীয় রঙ ও ভাল গুণাবলীর জন্য এ জাতের আম বিদেশে রপ্তানির সুযোগ রয়েছে। গাছ মধ্যম আকৃতির, মধ্যম ছড়ানো। আমের বাণিজ্যিক জাত ল্যাংড়ার পরে পাকে। ফল গোলাকার, আকারে মধ্যম, গড় ওজন ২৯০ গ্রাম, লম্বায় ৯.৫সেমি ও প্রস্থে ৮.১ সেমি, পুরুত্বে ৬.২ সেমি।

পাকা ফলের রঙ লাল আভাযুক্ত হলুদ ও শাঁসের রঙ হলুদ। স্বাদ হালকা মিষ্টি (টিএসএস ১৮%), শাঁস হালকা আঁশ বিহীন, আঁটির ওজন ৩৩ গ্রাম, খোসার ওজন ৩২ গ্রাম, ভক্ষণযোগ্য অংশ ৭৭% এবং সংরক্ষণ ক্ষমতা ভাল (৯-১১ দিন)। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০-২৫ টন।

বারি আম-৮

'বারি আম-৮' বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি বহুভ্রূণী (পলিএম্ব্রায়োনিক) নাবী জাত। পাহাড়ী এলাকা হতে সংগ্রহ করে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন করে ২০১০ সালে জাতটি অবমুক্ত করা হয়। এটি সুস্বাদু ও উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলধারী জাত।

গাছ তুলনামূলকভাবে খাটো ও ছড়ানো। প্রতিবছর ফল দেয় এবং জাতটি ফজলী আমের সাথে পাকে। ফল লম্বাটে ডিম্বাকৃতির , আকারে মধ্যম, গড় ওজন ২৭০ গ্রাম, লম্বায় ১১.৩ সেমি ও প্রস্থে ৭.০ সেমি, পুরুত্বে ৬.০ সেমি, পাকা ফলের রঙ হলুদাভ সবুজ, চামড়া পাতলা ও শাঁস কমলা বর্ণের, স্বাদ মিষ্টি (টিএসএস ২২%), শাঁস আঁশ বিহীন, আঁটির ওজন ২৬ গ্রাম, খোসার ওজন ৫০ গ্রাম, ভক্ষণযোগ্য অংশ ৭০% এবং সংরক্ষণ ক্ষমতা

অন্যান্য জাতের তুলনায় ৫-৭ দিন বেশি, জাতটি পলিএম্ব্রায়োনিক হওয়ায় বীজ থেকে মাতৃ গুণাগুণ সম্পন্ন চারা উৎপাদন করা যায়। দেশের সব এলাকায় এমনকি ঝড় প্রবণ উপকূলীয় অঞ্চলেও চাষোপযোগী। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০-২৫ টন।

বারি আম-৯ (কাঁচা মিঠা)

'বারি আম-৯' প্রতি বছর ফলদানকারী একটি উচ্চ ফলনশীল আগাম জাত। নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে ২০১১ সালে জাতটি অবমুক্ত করা হয়। গাছ বড় ও মধ্যম খাড়া। মাঘ মাসে গাছে মুকুল আসে এবং বৈশাখ মাসের শেষভাগে কাঁচা অবস্থায় খাওয়ার জন্য ফল আহরণ উপযোগী হয়।

উপবৃত্তাকার এ ফলের গড় ওজন ১৬৬ গ্রাম, কাঁচা ফলের শাঁস সাদা, আঁশহীন, মধ্যম মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১১%), খাদ্যোপযোগী অংশ ৬৮%। সাত বছর বয়স্ক গাছে হেক্টরপ্রতি ফলন ১.৩৫ টন। রাজশাহী অঞ্চলের জন্য বিশেষ উপযোগী।

বারি আম-১০

'বারি আম-১০' উচ্চ ফলনশীল, মাঝ মৌসুমী জাত। প্রতি বছর নিয়মিত ফল ধরে। ১০-১২ বছর বয়সের প্রতিটি গাছে গড়ে ২৯০টি ফল ধরে যার ওজন ৭২.৫ কেজি। ফল আঁশবিহীন এবং স্বাদ মিষ্টি (টিএসএস ১৬%)। ফল মাঝারী আকৃতির এবং গড় ওজন ২৫০ গ্রাম। ফল ওভাল আকৃতির এবং পাকা ফল হলুদ রঙের হয়ে থাকে। ফল সংগ্রহের উপযুক্ত সময় হল জুনের ২য় সপ্তাহ। ফলের শাঁস গাঢ় হলুদ রঙের হয়ে থাকে। ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ শতকরা ৬৪ ভাগ। এ জাতের আমে উল্লেখযোগ্য কোন রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ হয় না।

বারি আম-১১

'বারি আম-১১' বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি বারোমাসি আমের জাত। স্থানীয়ভাবে সংগ্রহের পর নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে ২০১৫ সালে বারি আম ১১ মুক্তায়ন করা হয়। উচ্চ ফলনশীল, প্রতি বছর তিনবার ফল ধারণ করে, ফলের আকার লম্বাটে, গড় ওজন ৩১৭ গ্রাম, হালকা সবুজ ত্বক

(কাঁচা), পাকা অবস্থায় হলুদাভ সবুজ, ফলটি লম্বায় ১১.৩ সেমি., প্রস্থ ৭.৯ সেমি. এবং পুরুত্ব ৭.০ সেমি.। আঁটির ওজন ২৫ গ্রাম, খোসার ওজন ৪১ গ্রাম, ভক্ষণযোগ্য অংশ শতকরা ৭৯ ভাগ। স্বাদ মিষ্টি (টিএসএস ১৮.৫%)।

আমের চাষাবাদ পদ্ধতি

জলবায়ু ও মাটি: আম প্রায় যে কোন প্রকার মাটিতে জন্মে। তবে আম গাছের জন্য মাটি গভীর হওয়া প্রয়োজন। সাধারণত ২-৬ মিটার গভীরতাযুক্ত মাটি আম চাষের জন্য উপযোগী। আম গাছের জন্য মাটি কিছুটা অম্লীয় হওয়া প্রয়োজন। আমের জন্য মাটির অম্লতা বা পিএইচ মান ৫.৫-৭.০ সর্বোত্তম।

স্থান নির্বাচন: আম বাগান স্থাপনের জন্য উঁচু ও সুনিষ্কাশিত জমি বেছে নিতে হবে। সেচের সুবিধার বিষয়েও নজর দেওয়া দরকার। বাগানটি বাজারের কাছে হলে ভাল হয় যাতে করে প্রয়োজনীয় সামগ্রী দ্রুত সংগ্রহ করা যায় এবং উৎপাদিত ফল সংরক্ষণ ও সহজে বাজারজাত করা যায়। রাস্তার পাশে বাগানের স্থান নির্বাচন করা হলে পরিবহন সুবিধা পাওয়া যাবে। এছাড়া জমির মূল্য কম হওয়া বাঞ্ছনীয়। শ্রমিকের সহজলভ্যতার কথাও বিবেচনায় আনা জরুরি।

জমি তৈরি: বাগান আকারে আমের চাষ করতে হলে প্রথমেই নির্বাচিত জমি ভাল করে চাষ ও মই দিয়ে জমি সমতল ও আগাছামুক্ত করে নিতে হবে। জমিতে পুরাতন গাছের গোড়া, ইট, পাথর কিংবা অন্যান্য কোনরকম জঞ্জাল থাকলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে। জমি উত্তমরূপে কর্ষণে গাছের শিকড় বৃদ্ধিতে সহায়ক এবং খাদ্যোপাদান সহজলভ্য হয়।

রোপণ প্রণালী: রোপণ প্রণালী হল বাগানে রোপিত চারার পারস্পারিক অবস্থান। প্রতি একক জমিতে কতটি চারা/কলম লাগানো সম্ভব তা নির্ভর করে রোপণ দূরত্ব, জমির আকৃতি এবং রোপণ পদ্ধতির উপর। বাগানে আম গাছ ত্রিভূজাকার, বর্গাকার, আয়তাকার ও ষড়ভূজাকার পদ্ধতিতে রোপণ করা যেতে পারে।

জাত নির্বাচন: জাত নির্বাচনের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। নিজের প্রয়োজনে বা বাজারজাত করার জন্য কোন জাতের আমের চাহিদা বেশি, গুণগতমান ভাল এবং বাজার মূল্য বেশি তা জানা দরকার। আমাদের দেশে অনেকগুলো উৎকৃষ্ট জাতের আম রয়েছে কিন্তু বেশিরভাগ জাতই রঙিন নয়। বিদেশের বাজারে রঙিন ও হালকা মিষ্টতাসম্পন্ন আমের চাহিদা বেশি। তাই আম রপ্তানী করার উদ্দেশ্য থাকলে রঙিন ও হালকা মিষ্টি জাতের আমের গাছ লাগাতে হবে। এজন্য প্রথমেই ঠিক করে নিতে হবে কি জাতের আমগাছ লাগানো হবে। আম জাত নিয়মিত ফল দেয় কিনা, আকার আকৃতি, আঁশ ও রসের পরিমাণ, মিষ্টতা, শতকরা ভক্ষণযোগ্য পরিমাণ, সংরক্ষণযোগ্যতা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে।

চারা নির্বাচন: সুস্থ-সবল ও রোগ-পোকার আক্রমণ মুক্ত চারা নির্বাচন করলে উত্তম ও পর্যাপ্ত ফলন পাওয়া সম্ভব। ২-৩ বছর বয়সী ভিনিয়ার বা ক্রেফট কলমের চারা লাগানোর জন্য উত্তম। বীজের চারা কখনও লাগানো উচিত নয় কারণ তাতে গাছের মাতৃগুণ বজায় থাকে না। এজন্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে চারা সংগ্রহ করতে হবে। আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র (আম গবেষণা কেন্দ্র), হর্টিকালচার সেন্টার অথবা বিএডিসি নার্সারি থেকে চারা সংগ্রহ করা ভালো।

চারা রোপণের সময়: চারা রোপণের উপযুক্ত সময় হল বর্ষার শুরু বা শেষ অর্থাৎ জৈষ্ঠ্য-আষাঢ় বা ভাদ্র-আশ্বিন মাস। পানি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলে বছরের অন্য সময়ও রোপণ করা চলে। তবে শীতকালে চারা না লাগানো ভালো।

রোপণ দূরত্ব: আম গাছ সাধারণত ১২ মিটার বা প্রায় ৪০ ফুট দূরত্বে লাগাতে হয়। এই দূরত্বের গাছ ৭০-৮০ বছর বা তার অধিককাল পর্যন্ত পরস্পর প্রতিযোগিতা করে না। তবে ইদানীং ১০ মিটার দূরত্বেও আম গাছ লাগানো হচ্ছে। তবে খাটো জাতের আম যেমন বারি আম-৩ (আম্রপালি) ৬-৮ মিটার দূরত্বে লাগানো যেতে পারে। ৮ মিটার দূরত্বে গাছ লাগালে প্রথম গাছটি বাগানের প্রান্ত থেকে রোপণ দূরত্বের অর্ধেক অর্থাৎ ৪ মিটার ভিতরে লাগাতে হবে যাতে ডানে-বামে সামনে-পিছনে মিলিয়ে মোট ৮ মিটার করে জায়গা পায়।

গর্ত তৈরি: বর্গাকার, আয়তকার বা ত্রিভূজাকার যে প্রণালীতে চারা রোপণ করা হবে সে অনুসারে বর্ষা শুরুর আগেই গর্ত করে জায়গা ঠিক করতে হয়। আমের জাত, জমির উচ্চতা ও আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে চারা রোপণের জায়গা চিহ্নিত করে সে স্থানে মোটামুটিভাবে ৭৫ সেমি, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ গভীরতায় গর্ত করতে হবে। গর্ত করার ১০-১৫ দিন পর গর্তের উপরের অংশের মাটির সাথে ১০ কেজি গোবর সার, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমপি, ২৫০ গ্রাম জিপসাম ও ৫০ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট মিশিয়ে মাটি উলট পালট করে গর্ত ভরাট করতে হবে।

চারা রোপণ: গর্ত ভর্তি করার ১০-১৫ দিন পর গর্তের মাঝখানে চারাটি সোজাভাবে লাগিয়ে তারপর চারিদিকে মাটি দিয়ে বলের চারপাশের মাটি সামান্য চেপে দিতে হবে। চারা রোপণের সময় মাটির বলটি যেন ভেঙ্গে না যায় এবং চারা বা কলমের গোড়াটি প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাটির নিচে ঢুকিয়ে না দেয়া হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। রোপণের পর চারাটি খুঁটি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। রোপণের পর বৃষ্টি না থাকলে কয়েকদিন পানি সেচ দিতে হবে।

চারা গাছের যত্ন: আমের চারা গাছ রোপণের পর তার জীবন ধারণ, সুষ্ঠু বর্ধন ও সুষম ফলদানের জন্য উপযুক্ত পরিচর্যা একান্ত প্রয়োজন। লাগানোর পর পরই চারা গাছে নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে। বর্ষাকাল ছাড়া সব ঋতুতেই পানি সেচ দেওয়া

প্রয়োজন। গাছের গোড়ায় মাটি দিয়ে কিছুটা উঁচু করে দেওয়া ভাল, এতে অতিবৃষ্টিতে গাছের গোড়ায় পানি জমে থাকলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। গরু ছাগলের হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রত্যেকটি চারা গাছে আলাদা আলাদাভাবে বেড়া বা খাঁচা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। খাঁচাটি বাঁশের খুঁটি দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে বেঁধে দিতে হবে।

চারা গাছের গোড়ায় যাতে আগাছা জন্মাতে না পারে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। কেননা আগাছা গাছের খাবার খেয়ে ফেলে। এজন্য নিয়মিতভাবে গাছের গোড়ার আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত সার প্রয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন। গাছের বয়স এবং মাটির উর্বরতার উপর সার প্রয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে। ২-৪ বছর বয়সের একটি আম গাছে ১০-১৫ কেজি জৈব সার, ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ১০০ গ্রাম এমপি, ১০০ গ্রাম জিপসাম এবং ১০ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বাড়ার সাথে সাথে সারের মাত্রাও বাড়াতে হবে। সার বর্ষাকালে এবং ২ কিস্তিতে দেওয়া ভাল। প্রত্যেক বছর গাছে সার দিতে হবে।

চারা গাছের গোড়ার কাঠামো ঠিক ও সোজা রাখার জন্য কিছু অপ্রয়োজনীয় ডাল ছাঁটাই করা উচিত। গাছে রোগাক্রান্ত, মরা, শুকনা ও দুর্বল ডাল থাকলে তা ছাঁটাই করে ফেলতে হবে। চারা গাছে এনথ্রাকনোজ, আগামরা, অঙ্গজ বিকৃতি ও মুকুল বিকৃতি ইত্যাদি রোগ দেখা দিতে পারে। এ অবস্থায় জরুরিভাবে তা দমন করতে হবে। তাছাড়া কোন ক্ষতিকর পোকার আক্রমণ বিশেষত পাতা কাটা উইভিল বা হপার পোকার আক্রমণ দেখা দিলে তা সাথে সাথে দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে। কলমের গাছ যে বছর লাগানো হয় তার পরবর্তী বছর থেকেই মুকুল বা ফুল আসতে পারে। ছোট গাছে ফল ধরতে দেওয়া ঠিক নয় কারণ তাতে গাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয় এবং গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই এসময় মুকুল ভেঙ্গে দিতে হবে। গাছের বয়স কমপক্ষে ৩/৪ বছর হলে ফুল বা ফল ধরতে দেওয়া উচিত।

ফলবান গাছে সার প্রয়োগঃ আম গাছের সুষম বৃদ্ধি এবং অধিক ফলনের জন্য প্রতি বছর সার ব্যবহার একান্ত দরকার। ফলন্ত গাছের বয়স, আকার এবং মাটির উর্বরতার উপর সারের পরিমাণ ঠিক করতে হয়। মাটিতে জৈব সার দেওয়া ভাল কারণ তাতে জমির যথেষ্ট উন্নতি সাধন হয় এবং গাছের ফল ধারণ ক্ষমতা বাড়ে। ২০ বছর বা এর অধিক বয়সের একটি আম গাছে ৫০ কেজি জৈবসার, ২ কেজি ইউরিয়া, ১ কেজি টিএসপি, ৫০০ গ্রাম এমপি, ৫০০ গ্রাম জিপসাম এবং ২৫ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স কম হলে সারের মাত্রাও কমাতে হবে। সমস্ত সার ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করা ভাল। প্রথম কিস্তিতে অর্ধেক সার বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং দ্বিতীয় কিস্তিতে বাকি সার আশ্বিন মাসে প্রয়োগ করতে হবে। মাটিতে রসের অভাব

থাকলে সার দেওয়ার সাথে সাথে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। গাছের খাদ্য আহরণকারী শিকড়গুলো গাছের কাণ্ড বা গোড়া থেকে দূরে থাকে তাই ছোট জাতের গাছের গোড়া থেকে ৩০-৫০ সেমি দুরে, মাঝারী গাছের ক্ষেত্রে ২-৩ মিটার দূরে এবং বড় গাছের ক্ষেত্রে দুই গাছের মধ্যবর্তী স্থানে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সার দুইভাবে দেওয়া যায়। ফলন্ত গাছের কাণ্ড থেকে ২ মিটার দূরত্বে ৩০ সেমি প্রশস্ত ও ১৫-২০ সেমি গভীর করে চক্রাকার নালা কেটে নালার ভিতর রাসায়নিক সার ও জৈব সার মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে অথবা দুপুর বেলা যতটুকু স্থানে গাছের ছায়া পড়ে ততটুকু স্থানে সার ছিটিয়ে কোদাল দ্বারা মাটি কুপিয়ে বা চাষ দিয়ে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

আগাছা দমন: আমগাছের গোড়ায় যাতে আগাছা জন্মাতে না পারে সেজন্য প্রতি বছর বাগানে চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথম দফা বর্ষা আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে এবং দ্বিতীয় দফা বর্ষা শেষ হয়ে আসার পর পরই জমিতে চাষ দিয়ে অতি সহজেই আগাছা দমন করা যায়। আম বাগানে চাষ দিলে আরো একটি উপকার পাওয়া যায় তা হলো চাষকৃত আগাছা পচে জৈব সারের কাজ করে। তাছাড়া রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ফলবান বৃক্ষের নিচের জমি সর্বদা আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

পরগাছা দমন: আমগাছে ২/৩ জাতের পরগাছা উদ্ভিদ জন্মাতে দেখা যায়। পরগাছা আমগাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে ব্যহত করে এবং গাছকে দুর্বল করে ফেলে। পরগাছা উদ্ভিদ শিকড়ের মত এক প্রকার হস্টোরিয়া তৈরি করে যা গাছের মধ্যে ঢুকে যায় এবং গাছের রস শোষণ করে। মারাত্মকভাবে আক্রান্ত ডাল মারা যেতে পারে।

ক্ষতিকর আগাছা মূলত: ডালের অগ্রভাগে জন্মায় ফলে আমের ফলনও হ্রাস পায়। এজন্য পরগাছায় আক্রান্ত ডাল ছোট অবস্থাতেই কেটে ফেলা উচিত। অর্কিড জাতীয় পরগাছা গাছের মোটা ডালে জন্মে তবে এগুলো তেমন ক্ষতিকারক নয়।

রোগ ও পোকা ব্যবস্থাপনা: ফলন্ত গাছে রোগ-পোকার আক্রমণে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। আম গাছে বিভিন্ন রোগের আক্রমণ হতে পারে। রোগের মধ্যে এনথ্রাকনোজ, গ্যামোসিস, পাউডারী মিলডিউ, বোঁটা পচা, আগা মরা, বিকৃতি, লাল মরিচা এবং সুটি মোল্ড উল্লেখযোগ্য। পোকার মধ্যে হপার বা শোষক পোকা, পাতা কাটা উইভিল, ফল ছিদ্রকারী পোকা, এপসিলা, ফলের মাছি পোকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে থাকে। পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ, সময়মত প্রয়োজনীয় কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক স্প্রে ও সেক্স ফেরোমোন ব্যবহার করে এ সমস্ত রোগ বা পোকা ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা অপরিহার্য।

প্রতি বছর আম উৎপাদনের জন্য করণীয়

- নিয়মিত ফলদানকারী জাত অর্থাৎ প্রতি বছর ফলন দেয় এমন জাতের চাষাবাদ করতে হবে।
- প্রতি বছর ফল আহরণের পর জৈব সার সহ প্রয়োজনীয় পরিমাণে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে।
- দু-এক বছর অন্তর সবুজ সারের চাষ করলে জমি ও গাছের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে যা নিয়মিত ফলদানে সহায়ক হবে।
- খরাকালীন অবস্থায় সেচের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।
- গাছে যে বছর প্রচুর মুকুল আসে সেই মুকুলের কিছু অংশ যেমন এক-চতুর্থাংশ বা এক-তৃতীয়াংশ ছেঁটে দিলে (Deblossolming) পরের বছর সেই অংশে মুকুল ও ফল আসবে।
- সঠিক সময়ে ও সঠিক পদ্ধতিতে টিপ প্রুনিং (কাণ্ডের আগা ছাঁটাই) করলে পরের বছর ভালো ফলন পাওয়া যেতে পারে।
- গাছ বেশি জোরালো হয়ে গেলে ফলধারণ করে না বা অল্প ফল দেয় সে ক্ষেত্রে ২-৩ বছর বয়সী শাখায় (১৫ সেমি ব্যাসযুক্ত) জুলাই-আগস্ট মাসে বলয়করণ (Ringing) অর্থাৎ রিং আকারে ৬ মিমি বা সিকি ইঞ্চি পরিমাণ ছাল তুলে ফেললে মৌসুমে মুকুল আসবে।

আমের রোগসমূহ ও প্রতিকার

আম উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হল পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ। রোগবালাইয়ের উপর আবহাওয়ার বিশেষ প্রভাব রয়েছে। আবহাওয়া অনুকূল হলে, রোগ জীবাণুর বেঁচে থাকা, বংশ বৃদ্ধি, আক্রমণ ও বিস্তার সহজ হয়। প্রধান প্রধান রোগগুলো আমের মুকুল, কচি পাতা, পাতার কুড়ি, আমের গুটি, পূর্ণাঙ্গ আম এবং সংগ্রহোত্তর আমে আক্রমণ করে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করতে পারে। পোকা দমনের ক্ষেত্রে আম চাষীগণ কিছুটা অগ্রগতি অর্জন করলেও রোগ দমনের ক্ষেত্রে তাদের ধারণা একেবারেই কম। আমের উৎপাদন বাড়াতে হলে রোগ দমন অপরিহার্য। তাই আমাদের দেশে আমের প্রধান রোগসমূহ ও প্রতিকার সম্পর্কে নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

এনথ্রাকনোজ (Anthracnose)

বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে আম ফসলের সবচেয়ে ক্ষতিকর রোগ হচ্ছে এ্যানথ্রাকনোজ। রোগের আক্রমণ ব্যাপক এবং বিস্তৃত। কারণ এর জীবাণু কচি পাতা, নতুন কুঁড়ি, ছোট আম, বাড়ন্ত আম ও মুকুলে, আক্রমণ করে ব্যাপক

ক্ষতিসাধন করতে পারে। রোগের আক্রমণ সারা বছর দেখা গেলেও মুকুল ও বাড়ন্ত আমে সব চেয়ে বেশি ক্ষতি করে। মুকুলের আক্রমণে ফলধারণ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। বেশি আক্রান্ত পাতা ঝরে পড়ে ফলের গাছ দুর্বল হয়ে যায়। তাছাড়া আম রোগাক্রান্ত হলে আমের বাজার দর কমে যায়। বেশি বৃষ্টিপাতযুক্ত এলাকায় এ রোগের আক্রমণ বেশি হয়ে থাকে। আমাদের দেশের বাণিজ্যিক জাতগুলোর মধ্যে খিরসাপাত, গোপালভোগ ইত্যাদি জাতে রোগের আক্রমণ বেশি দেখা যায় অপরদিকে ফজলী, ল্যাংড়া, বারি আম-১, ২ ইত্যাদি জাতে রোগের আক্রমণ কম হয়ে থাকে।

জীবাণু: *Colletotrichum gloeosporioides* নামক এক প্রকার ছত্রাক।

রোগের লক্ষণ:

এ রোগের আক্রমণ আমগাছের কচি পাতা, কাণ্ড, মুকুল, কুঁড়ি ও ফলে প্রকাশ পায়। পাতায় অসম আকৃতির ধুসর বাদামী বা কালচে রঙের দাগ পড়ে। পাশাপাশি দাগসমূহ একত্রিত হয়ে বড় দাগের সৃষ্টি করতে পারে। বেশি আক্রান্ত পাতা ঝরে পড়ে। কচি পাতার আক্রান্ত স্থানের কোষগুলি দ্রুত মারা যায়। আমের মুকুল বা ফুল আক্রান্ত হলে কালো দাগ দেখা দেয়। আক্রান্ত ফুল মারা যায় ও ঝরে পড়ে। মুকুলে আক্রমণ হলে ফল ধারণ ব্যহত হয়। আম ছোট অবস্থায় আক্রান্ত হলে আমের গায়ে কালো দাগ দেখা দেয়। আক্রান্ত ছোট আম ঝরে পড়ে। বাড়ন্ত আমে রোগের জীবাণু আক্রমণ করে সুপ্তাবস্থায় থাকে। এ সময় রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। আম পাকা শুরু করলে আমের মিষ্টতা বাড়তে থাকে তখন জীবাণু সক্রিয় হয়ে উঠে এবং পাকা আমে ধুসর বাদামী বা কালো দাগের সৃষ্টি করে। গুদামের আবহাওয়া অনুকুল হলে রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করতে পারে। আম বড় হওয়ার সময় ঘন ঘন বৃষ্টি ও মেঘলা আবহাওয়া বিরাজ করলে আমে এই রোগের আক্রমণ বেশি দেখা যায়।

বিস্তার:

গাছের রোগাক্রান্ত ডাল বা গাছের নিচে পড়ে থাকা রোগাক্রান্ত ডাল ও পাতায় এ রোগের জীবাণু দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে। অনুকূল আবহাওয়ায় ছত্রাকের বীজকণা বা কনিডিয়া এ সব জায়গা হতে বাতাসের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং আমের মুকুল, কচি পাতা, কাণ্ড বা বাড়ন্ত আমকে আক্রমণ করে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও আর্দ্র আবহাওয়া রোগের দ্রুত বিস্তারে সাহায্য করে। মুকুল ধরা অবস্থায় বৃষ্টিপাত বা কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া বিরাজ করলে মুকুলের ফুল আক্রান্ত হয়ে ঝরে পড়ে এবং ফলধারণ হতে পারে না।

আক্রান্ত পাতা

আক্রান্ত মুকুল

আক্রান্ত কচি আম

আক্রান্ত বাড়ন্ত আম

আক্রান্ত পাকা আম

প্রতিকার:

- প্রতি বছর আম সংগ্রহের পর রোগাক্রান্ত বা মরা ডালপালা ছাঁটাই করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- গাছের রোগাক্রান্ত ঝরা পাতা ও ঝরে পড়া আম সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে বা মাটি চাপা দিতে হবে।
- মুকুলে রোগের আক্রমণ প্রতিহত করতে হলে মেনকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। মুকুল ১০-১৫ সেমি লম্বা হলেই প্রথম স্প্রে শেষ করতে হবে। আম মটর দানার মত হলে দ্বিতীয় বার স্প্রে করতে হবে। এতে কচি আমে আক্রমণ প্রতিহত করবে এবং আম ঝরে পড়া কম হবে। কীটনাশকের সাথে এসব ছত্রাকনাশক মিশিয়ে একত্রে স্প্রে করা যেতে পারে।
- বাড়ন্ত আমকে রোগমুক্ত রাখতে হলে আম সংগ্রহের ১৫ দিন আগ পর্যন্ত মেনকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন-ডায়থেন এম -৪৫/ পেনকোজেব/ ইন্ডোফিল এম -৪৫ ইত্যাদি) প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে বা কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন-ব্যাভিস্টিন) প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে ১৫ দিনের ব্যবধানে ৩/৪ বার স্প্রে করতে হবে।
- গাছ থেকে আম পাড়ার পরপরই গরম পানিতে (৫৫০ সে. তাপমাত্রায় ৫ মিনিট) ডুবিয়ে রাখার পর শুকিয়ে গুদামজাত করতে হবে। আম রোগাক্রান্ত হয়ে থাকলে এ ট্রিটমেন্টে জীবাণু মারা যাবে এবং আম রোগমুক্ত হবে । আম প্যাকিং এর আগে গরম পানিতে ট্রিটমেন্ট করে নেওয়া ভাল কারণ তাতে আমের সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ে, আম রোগমুক্ত থাকে এবং আমের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। তবে পাকা ও আঘাতপ্রাপ্ত আম গরম পানিতে ডুবানো উচিত নয়।

বোঁটা পচা (Stem-end rot)

বোঁটা পচা সংগ্রহোত্তর আমের একটি মারত্মক ক্ষতিকারক রোগ। এ্যানথ্রাকনোজ রোগের পর পাকা আমে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে বোঁটা পচা রোগ। বাংলাদেশের সব এলাকায় এবং সব জাতে এ রোগের আক্রমণ দেখা যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের আমে বাজার জরীপ করে দেখা গেছে, রোগটি শতকরা ১৫ ভাগ পর্যন্ত আম নষ্ট করে থাকে। রোগের আক্রমণে সম্পূর্ণ আমটি ২/৩ দিনের মধ্যেই পচে যায়। রোগের আক্রমণ বেশি হলে ক্ষতির পরিমাণও বাড়তে থাকে। ল্যাংড়া, বারি আম-১, ২ ও ৩ এই রোগের আক্রমণ কম হয়।

জীবাণু: *Lasiodiplodia theobromae* নামক এক প্রকার ছত্রাক।

রোগের লক্ষণ:

আম গাছ থেকে পাড়ার পর পাকতে শুরু করলে বোঁটা পচা রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে। প্রথমে বোঁটায় বাদামী অথবা কালো দাগ দেখা দেয়। দাগ দ্রুত বাড়তে থাকে এবং গোলাকার হয়ে বোঁটার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। জীবাণু ফলের শাঁসকে আক্রমণ করে এনজাইম নিঃসরণের মাধ্যমে আমের কোষগুলোকে দ্রুত পচিয়ে ফেলতে পারে। আক্রান্ত আম ২/৩ দিনের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যায়। রোগের জীবাণু বোঁটা ছাড়াও অন্যান্য আঘাতপ্রাপ্ত স্থান দিয়ে আমের ভিতরে প্রবেশ করে আম পচিয়ে ফেলতে পারে।

বিস্তার:

রোগের জীবাণু রোগাক্রান্ত মরা ডাল বা কাণ্ডে অবস্থান করে। বর্ষাকাল শুরু হলে ছত্রাকের বীজকণা বা কনিডিয়ার উৎপাদন বেড়ে যায় এবং বাতাসের মাধ্যমে তা বিস্তার লাভ করে। গাছ থেকে আম পাড়ার পর গাছের নিচে জমা করে রাখলে বাতাসে ভাসমান জীবাণু বোঁটার আঠায় পতিত হয়ে আটকে যায়। উচ্চ তাপ এবং আদ্র আবহাওয়ায় এই রোগের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে।

প্রাথমিক বাড়ন্ত আম

মারাত্মক বাড়ন্ত আম

প্রতিকার:

- মেঘমুক্ত রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে গাছ থেকে আম পাড়তে হবে। আম পাড়ার সময় যাতে আঘাত না পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

- ৫ সেমি (২ ইঞ্চি) বোঁটাসহ আম পাড়লে রোগের আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।
- আম পাড়ার পর গাছের তলায় জমা না রেখে দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে যাতে বাতাসে ভাসমান রোগের জীবাণু বোঁটায় পতিত হওয়ার বা আক্রমণ করার সুযোগ না পায়।
- আম পাড়ার পর পরই গরম পানিতে (৫৫০ সে. তাপমাত্রার পানিতে ৫ মিনিট) অথবা ব্যাভিস্টিন দ্রবণে (প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম) ৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখার পর গুদামজাত করলে বোঁটা পচা রোগের আক্রমণ হয় না।

পাউডারি মিলডিউ (Powdery mildew)

পাউডারি মিলডিউ একটি মারাত্মক রোগ। আমাদের দেশে এ রোগের আক্রমণ প্রত্যেক বছর দেখা যায় না। তবে প্রত্যেক বছরই রোগের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন বছর অনুকূল আবহাওয়া বিরাজ করলে রোগটি মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। এ রোগের জীবাণু আমের মুকুলে আক্রমণ করে। আক্রান্ত মুকুল সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে ফলধারণ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে।

জীবাণু: *Oidium managiferae* নামক এক প্রকার ছত্রাক।

রোগের লক্ষণ:

পাউডারি মিলডিউ রোগের আক্রমণ প্রধানত আমের মুকুল ও কচি আমে প্রকাশ পায়। প্রথমে আমের মুকুলের শীর্ষ প্রান্তে সাদা বা ধূসর বর্ণের পাউডারের আবরণ দেখা যায়। এই পাউডার হচ্ছে ছত্রাক জালিকা ও তার বীজকণার সমষ্টি। হালকা বৃষ্টি, মেঘলা বা কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশ এ রোগের জীবাণুর ব্যাপক উৎপাদনের সহায়তা করে। অনুকূল আবহাওয়ায় এই পাউডার সম্পূর্ণ মুকুলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত মুকুলের সমস্ত ফুল নষ্ট হয়ে যায়। এ অবস্থায় শুধুমাত্র মুকুলের দণ্ডটি দাঁড়ায়ে থাকে। আক্রমন বেশি হলে সমস্ত মুকুল নষ্ট হওয়ায় গাছে কোন ফলধারন হয় না। কোন কোন সময় কম আক্রান্ত মুকুলে আম ধরতে দেখা যায়। তবে এ ধরনের আমের চামড়া খসখসে হয়। বেশি আক্রান্ত কচি আম ঝরে পড়ে।

আক্রান্ত মুকুল

মারাত্মক আক্রান্ত আম গাছ

বিস্তার

ছত্রাকের জীবাণু বাতাসের মাধ্যমে রোগাক্রান্ত মুকুল থেকে সুস্থ মুকুলে বিস্তার লাভ করে। আর্দ্র,

গরম আবহাওয়া, রাতের তাপমাত্রা কম থাকলে এ রোগ দ্রুত বাড়তে পারে। বীজকণা বাতাসের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে মুকুলের উপর পতিত হওয়ার ৫/৭ ঘণ্টার মধ্যে অঙ্কুরোদগম হয়। মেঘাছন্ন ও সকালের ঘন কুয়াশায় রোগের জীবাণু দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

প্রতিকার

মুকুল আসার সময় প্রতিদিন আম গাছ পর্যবেক্ষণ করতে হবে মুকুলে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিয়েছে কিনা। রোগের লক্ষন দেখা দিলেই সালফার গ্রুপের ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৫-৭ দিনের ব্যবধানে দুই বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।

আমের আঠা ঝরা এবং হঠাৎ মড়ক (Gummosis and sudden decline)

বর্তমানে আম গাছের যে রোগ দেখা যায় তাদের মধ্যে আমের আঠা ঝরা এবং হঠাৎ মড়ক সবচেয়ে মারাত্মক । কারণ এ রোগে আক্রান্ত গাছ খুব অল্প সময়ের মধ্যে মারা যায় ।

জীবাণু: *Lasiodiplodia theobromae* নামক এক প্রকার ছত্রাক।

রোগের লক্ষণ:

প্রথমে কাণ্ড বা ধড় অথবা মোটা ডালের কিছু কিছু জায়গা থেকে হালকা বাদামী থেকে গাড় বাদামী বা কলো রঙের আঠা বা রস বের হতে থাকে। বেশি আক্রান্ত ডগা বা ডালটি অল্প দিনের মধ্যেই মারা যায়। এ অবস্থায় মরা ডালে পাতাগুলো

প্রাথমিক আক্রমণ

মারাত্মক আক্রান্ত বড় আম গাছ

আংশিক মারা যাওয়া গাছ

সম্পূর্ণ মারা যাওয়া গাছ

কিছু ভালো অংশসহ আক্রান্ত স্থানের বাকল এভাবে তুলে ফেলতে হবে

বাকল তুলে এভাবে বোর্দো পেস্টের প্রলেপ

ডগায় আঁটকে থাকে । কোন কোন ক্ষেত্রে পাতাগুলো কিছুদিন পর ঝরে পড়ে । কিছুদিন পর দেখা যায় আরেকটি ডাল একইভাবে মারা যাচ্ছে। এভাবে এক পর্যায়ে সম্পূর্ণ গাছ মারা যেতে পারে।

প্রতিকার:

- আক্রান্ত গাছে সুষম মাত্রায় গোবর/পচা আবর্জনা/কম্পোস্ট ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে এবং নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে।
- গাছে মরা বা ঘন ডাল পালা থাকলে তা নিয়মিত ছাঁটাই করতে হবে।
- নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করতে হবে এবং আক্রমণ দেখা মাত্রই আঠা বা রস বের হওয়ার স্থানের ছাল/বাকল কিছু সুস্থ অংশসহ তুলে ফেলে দিয়ে উক্ত স্থানে বোর্দো পেস্টের প্রলেপ দিতে হবে।

  (বোর্দো পেস্ট ঃ ১০০ গ্রাম তুঁতে ও ১০০ গ্রাম চুন ১ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করা যায়।)
- বেশি আক্রান্ত/শুকনো ডাল কিছু সুস্থ অংশসহ কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কাটা অংশে রোগের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বোর্দো পেস্টের প্রলেপ দিতে হবে।
- যে সকল গাছে পেষ্টের প্রলেপ দেওয়া সম্ভব না সেক্ষেত্রে বোর্দো মিক্সার অথবা কপার অক্সিক্লোরাইড জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন- কুপ্রাভিট প্রতি লিটার পানিতে ৭ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে ।

  (বোর্দো মিক্সার: ১০ গ্রাম তুঁতে, ১০ গ্রাম চুন ও ১ লিটার পানির মিশ্রণ।)
- কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন- ব্যভিস্টিন প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে অথবা ক্যাবরিওটপ প্রতি লিটার পানিতে ৩ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৭-১০ দিনের ব্যবধানে ৩/৪ বার সম্পূর্ণ গাছ ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে ।

আগামরা (Die back)

বাংলাদেশের প্রায় সব এলাকাতেই আগা মরা রোগের আক্রমণ দেখা যায়। সব বয়সের গাছে আক্রমণ দেখা দিলেও অপুষ্টিতে আক্রান্ত গাছে আক্রমণ বেশি পরিলক্ষিত হয়। প্রথম আক্রমণ কাণ্ডের শীর্ষদেশে প্রকাশ পায় এবং মরা ডাল উপরের দিক থেকে নিচের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। সেজন্য এ রোগকে আগামরা নামে অভিহিত করা হয়। রোগের আক্রমণে গাছ দুর্বল হয়ে যায় এবং গাছের ফলধারণ ক্ষমতা কমে যায়।

জীবাণু: *Colletotrichum gloeosporioides* এবং *Lasiodiplodia theobromae* নামক ছত্রাক। প্রথমটির চাইতে দ্বিতীয় ছত্রাকটি বেশি ক্ষতি করে থাকে।

রোগের লক্ষণ:

আক্রান্ত ডগা

আক্রান্ত কম বয়সী গাছ

আক্রান্ত বয়স্ক গাছ

আক্রান্ত ডাল কর্তন

রোগের জীবাণু প্রথমে কচি পাতায় আক্রমন করে। আক্রান্ত পাতা বাদামী এবং পাতার কিনারা মুড়িয়ে যায়। পাতাটি দ্রুত মারা যায় ও শুকিয়ে যায়। আক্রমণ পাতা থেকে কুঁড়িতে ছড়িয়ে পড়ে এবং ডগার অগ্রভাগ মেরে ফেলে। মরা অংশ নিচের দিকে অগ্রসর হতে থাকে ফলে বহু দূর থেকে আগামরা রোগের লক্ষণ বোঝা যায়। আক্রান্ত ডগাটির কোষ বিবর্ণ হয়ে উঠে। ডগাটি লম্বালম্বিভাবে কাটলে যা সহজেই নজরে পড়ে। পরিবহন কলায় বাদামী লম্বা দাগের সৃষ্টি করে। প্রাথমিক অবস্থায় রোগ দমন না করলে রোগ সমস্ত ডালে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রমণ বেশি হলে গাছ মারা যেতে পারে।

বিস্তার

রোগের জীবাণু মরা ডাল বা পুরাতন পাতায় অবস্থান করে। রোগের বীজকণা বাতাসের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে নতুন পাতা ও ডগায় আক্রমণ করে। উচ্চ তাপমাত্রা, শতকরা ৮০ ভাগের উর্ধ্বে বাতাসের আর্দ্রতা এবং বৃষ্টিপাত এ রোগের আক্রমণ ও বিস্তারে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে।

প্রতিকার:

- আক্রান্ত গাছে সুষম মাত্রায় গোবর/আবর্জনা পচা/কম্পোস্ট এবং রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে এবং নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে।
- নিয়মিত বাগান পরিদর্শন করতে হবে এবং গাছে মরা বা ঘন ডালপালা থাকলে তা ছাঁটাই করতে হবে। ছাঁটাইকৃত ডালপালা গাছের নিচে জমা না করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে ।
- আক্রান্ত ডাল কিছু সুস্থ অংশসহ কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কাটা অংশে রোগের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বোর্দো পেস্টের প্রলেপ দিতে হবে।
  (বোর্দো পেস্ট : ১০০ গ্রাম তুঁতে ও ১০০ গ্রাম চুন ১ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে পেষ্ট তৈরি করা যায়)

- যে সকল গাছে পেস্টের প্রলেপ দেওয়া সম্ভব না সেক্ষেত্রে বোর্দো মিক্সার অথবা কপার অক্সিক্লোরাইড জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন- কুপ্রাভিট প্রতি লিটার পানিতে ৭ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে ।

(বোর্দো মিক্সার: ১০ গ্রাম তুঁতে, ১০ গ্রাম চুন ও ১ লিটার পানির মিশ্রণ)

- নতুন পাতা বের হলে কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন- ব্যাভিস্টিন প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে অথবা ক্যাবরিওটপ প্রতি লিটার পানিতে ৩ গ্রাম হারে ৭-১০ দিনের ব্যবধানে ৩/৪ বার সম্পূর্ণ গাছ ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।

লাল মরিচা (Red rust)

লাল মরিচা রোগটি বাংলাদেশের প্রায় সব এলাকাতেই কম বেশি দেখা যায়। এ রোগের আক্রমণ প্রধানত বর্ষাকালে দেখা যায়। রোগটি তেমন মারাত্মক নয়, তবে গাছ বেশি আক্রান্ত হলে দুর্বল হয়ে পড়তে পারে বারি আম-৩ (আম্রপালি) ও আশ্বিনা জাতে এ রোগের আক্রমণ বেশি দেখা যায়।

জীবাণু: *Cephaleuros virescens* নামক এক প্রকার শৈবালের আক্রমণে লাল মরিচা রোগ সংগঠিত হয়

প্রাথমিক আক্রান্ত পাতা

মারাত্মক আক্রান্ত পাতা

আক্রান্ত ফলবান গাছ

রোগের লক্ষণ:

লাল মরিচা রোগ প্রধানত পাতায় দেখা যায় তবে কোন কোন সময় পাতার বোঁটা বা কচি কাণ্ডে দেখা দিতে পারে। প্রথমে পাতায় ধূসর-সবুজ রঙের দাগ পড়ে। পরবর্তীতে এই দাগ সুস্পষ্ট লালচে বাদামী রঙ ধারণ করে। দাগগুলি প্রায় গোলাকার এবং কিছুটা উঁচু মনে হয়। কয়েকটি দাগ একত্রিত হয়ে অসম আকৃতির বড় দাগের সৃষ্টি করে। দাগের মধ্যে অবস্থিত শৈবালের দেহ কিছুটা মখমলের মত কোমল মনে হয়। শৈবালের মাথায় বীজকণা থাকে যা বাতাসে ঝরে পড়লে দাগের রঙ ঘিয়ে রঙে রূপান্তরিত হয়। আক্রান্ত স্থানের কোষগুলি মারা যায়। আক্রমণ বেশি হলে পাতায় খাদ্য উৎপাদন এলাকা কমে যায় এবং গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে।

বিস্তার

শৈবালের বীজকণা বাতাস অথবা ঝাপটার মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে নতুন পাতাকে আক্রমণ করে। অধিক তাপমাত্রা ও বাতাসের আর্দ্রতা এ রোগের বৃদ্ধি ও বিস্তারে সহায়তা করে। তাই বর্ষাকালে রোগের আক্রমণ বেশি দেখা যায়।

প্রতিকার:

- রোগ প্রতিরোধী জাতের আমগাছ লাগাতে হবে। রোগাক্রান্ত ঝরা পাতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- বেশি আক্রান্ত ডগা ছাঁটাই করে ছাঁটাইকৃত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- কপারঘটিত ছত্রাকনাশক যেমন- কুপ্রাভিট/ সালকক্স প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে অথবা বোর্দো মিক্সচার ১৫ দিন পর পর ৪/৫ বার স্প্রে করে গাছ রোগমুক্ত রাখা যায়।
- ফলিকুর প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে স্প্রে করেও গাছ রোগমুক্ত রাখা যায়।

বিকৃতি (Malformation):

বিকৃতি রোগটি তিন দশক পূর্বে আমাদের দেশে ছিল না। রোগটি আমাদের দেশে তেমন সমস্যা না হলেও ভারতের কোন কোন জাতে এটি মারাত্মক সমস্যারূপে চিহ্নিত । আক্রমণের স্থান অনুযায়ী বিকৃতি দুই প্রকার। যথা- মুকুলের বিকৃতি (Floral malformation) ও দৈহিক বিকৃতি (Vegetative malformation)। বিকৃত মুকুলে ফলধারণ হয় না, তাই ফলন মারাত্মকভাবে কমে যেতে পারে। দৈহিক বিকৃতি কেবল চারা গাছ বা ছোট গাছে দেখা যায়। বেশি আক্রান্ত চারা গাছ মরে যেতে পারে। বাংলাদেশের জাতগুলোর মধ্যে লতাবোম্বাই, বারি আম-৩ ও খিরসাপাতে বিকৃত মুকুল বেশি দেখা যায়।

জীবাণু: প্রথমদিকে এ রোগের জীবাণু সম্পর্কে বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- শরিরতাত্ত্বিক, ভাইরাস, মাইট, বা ছত্রাকজনিত। সম্প্রতি *Fusarium moniliforme* var. subglutinans নামক ছত্রাকই এ রোগের প্রকৃত কারণ বলে অনেক বিজ্ঞানী ঐক্যমত পোষণ করেন।

রোগের লক্ষণ:

দৈহিক বিকৃতি: কাণ্ড বা দৈহিক বিকৃতি প্রধানত চারা বা ছোট গাছে দেখা যায়। আক্রান্ত কাণ্ডের মাথায় বা গিঁটে অসংখ্য নতুন কুঁড়ি বের হয়। কুঁড়িগুলি বেশ শক্ত ও ছোট ছোট পাতাযুক্ত হয়ে থাকে। কুঁড়িগুলি বড় হয় না বরং গিঁটের চর্তুদিকে আরো কুঁড়ি বের হয়ে জটলার সৃষ্টি করে। এক সময় নতুন কুঁড়িগুলি মারা যায়। মারাত্মকভাবে আক্রান্ত চারাগাছের বৃদ্ধি হয় না এতে গাছ দুর্বল হয়ে মারা যেতে পারে। ৭/৮ বছরের বেশি বয়সের গাছে সাধারনত দৈহিক বিকৃতি দেখা যায় না।

মুকুলের বিকৃতি: মুকুলের বিকৃতি স্বভাবতই ফলবান গাছে পরিলক্ষিত হয়। রোগাক্রান্ত মুকুলে অসংখ্য শাখা প্রশাখা বের হয়। এসব শাখা প্রশাখা বেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, মোটা ও তুলনামুলকভাবে শক্ত হয়ে থাকে। দেখতে অনেকটা জটলার মত

মনে হয়। বিকৃত মুকুলে উভলিঙ্গ ফুল তেমন না থাকায় কোন ফলধারণ করে না।

বিকৃত মুকুল ২/৩ মাস পর্যন্ত গাছে আঁটকে থাকতে দেখা যায়। বিকৃতি রোগের বিস্তার কিভাবে হয়ে থাকে তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে তবে এ রোগ বীজ দ্বারা বাহিত হয় না বলে জানা গেছে।

দৈহিক বিকৃতি

মুকুলের বিকৃতি

প্রতিকার:

- রোগমুক্ত গাছের বীজ থেকে চারা উৎপাদন করতে হবে এবং কলম তৈরি করার সময় রোগমুক্ত গাছ থেকে ডগা বা সায়ন (Scion) সংগ্রহ করতে হবে।
- রোগমুক্ত এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা-সম্পন্ন জাতের আমগাছ লাগাতে হবে। বারি আম-১, ২, ল্যাংড়া, ফজলী ইত্যাদি জাতে বিকৃতি রোগ খুব কম দেখা যায়।
- দৈহিক বিকৃত কুঁড়িগুলি ভেঙ্গে ফেলতে হবে অথবা আক্রান্ত স্থান কেটে ফেলতে হবে।
- বিকৃত মুকুল দেখা দেওয়া মাত্রই কেটে ফেলতে হবে।
- ব্যাভিস্টিন প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে ১০ দিন পর পর ৪/৫ বার স্প্রে করে গাছ রোগমুক্ত রাখা যায় ।
- মুকুল বের হওয়ার প্রায় ৩ মাস পূর্বে (অর্থাৎ অক্টোবর মাসে) ন্যাপথালিন এসিটিক এসিড (NAA) শতকরা ০.০২ ভাগ হারে স্প্রে করলে রোগের তীব্রতা কমে যায়।

ঝুল রোগ (Sooty mould)

আম ছাড়াও পেঁয়ারা, কুল ইত্যাদি ফলে ঝুল রোগের আক্রমণ হতে দেখ যায়। এ রোগের জীবাণু পকৃতপক্ষে পরজীবী নয় কারণ তারা পাতার কোষে প্রবেশ করে না বা পাতা থেকে খাদ্য গ্রহণ করে না। রোগটি প্রত্যক্ষভাবে আম গাছের ক্ষতি করে না, তবে এ রোগের কারণে পাতায় খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। এতে গাছ দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া ঝুল রোগে আক্রান্ত আম খারাপ দেখায়, ফলে আমের বাজার দর কমে যায়।

জীবাণু: *Capnodium mangiferac* ও *Meliola mangiferae* নামক দুটি ছত্রাক।

রোগের লক্ষণ:

ঝুল রোগের আক্রমণে পাতার উপর কালো আবরণ পড়ে। এই কালো আবরণ হচ্ছে ছত্রাকের দেহ (Mycellium) ও বীজকণার সমষ্টি। আমের শরীরেও কালো আবরণ দেখা দেয়।

ঝুল রোগে আক্রান্ত মুকুল

ঝুল রোগে আক্রান্ত পাতা

বিস্তার:

রোগের বীজকণা বা কণিডিয়া বাতাসের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে থাকে। হপার বা শোষক পোকা আমের মুকুলের মারাত্মক শত্রু। এ পোকা মুকুল থেকে অতিরিক্ত রস শোষণ করে এবং মধু জাতীয় এক প্রকার আঠালো পদার্থ (যা হানিডিউ নামে পরিচিত) নিঃসরণ করে। উক্ত হানিডিউ মুকুল ও পাতার উপর পতিত হয় তার উপর ছত্রাকের বীজকণা জন্মায় এবং কালো আবরণের সৃষ্টি করে। হপার ছাড়াও ছাতরা পোকা (মিলিবাগ) ও স্কেল পোকা (Scale insect) হানিডিউ নিঃসরণ করে এবং ঝুল রোগের আক্রমণে সহায়তা করে। হানিডিউ ছাড়া এ রোগ জন্মাতে পারে না।

প্রতিকার:

- হানিডিউ নিঃসরণকারী হপার, মিলিবাগ বা স্কেল পোকা কীটনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে দমনে রাখতে পারলে ঝুল রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।
- আক্রান্ত গাছে সালফার গ্রুপের ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়।

দাঁদ (Scab)

কয়েক বছর আগেও দাদ রোগের প্রকোপ বাংলাদেশ তেমন মারাত্মক ছিল না। তবে বর্তমানে এ রোগটি মারাত্মক আকারে দেখা দিয়েছে। মোটামুটি সব জাতেই এ রোগের আক্রমণ দেখা যায়। দেশীয় জাতগুলোর মধ্যে খিরাসাপাতে দাদ রোগের আক্রমণ সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। ছোট আমে আক্রমণ হলে আম ঝরে পড়ে, তাই ফলন কমে যায়। অপরদিকে বড় আম আক্রান্ত হলে আমের শরীর খসখসে হয়ে যায় এবং আমের বাজার দর কমে যায়।

জীবাণু: *Elsinoe mangiferae* নামক এক প্রকার ছত্রাক।

প্রাথমিক আক্রমণ

আক্রান্ত গুটি আম

আক্রান্ত বাড়ন্ত আম

রোগের লক্ষণ:

আম মটর দানার মত হলেই এ রোগের আক্রমণ শুরু হতে পারে। আক্রান্ত আমের শরীর বাদামী রঙ ধারণ করে, খোসা ফেটে যায় ও খসখসে হয়ে উঠে। আক্রান্ত আমের বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং কয়েক দিনের মধ্যে তা ঝরে পড়ে। রোগের আক্রমণে বাড়ন্ত আমের শরীরে বাদামী দাগের সৃষ্টি হয়। অনুকূল আবহাওয়ায় দাগগুলো বাড়তে থাকে এবং সম্পূর্ণ আমের শরীর ঢেকে ফেলে। আক্রান্ত স্থানের চামড়া নষ্ট হয়ে যায়। আমের শরীর খসখসে অমসৃণ হওয়ার কারণে আমের বাজার দর কমে যায়।

প্রতিকার:

রোগের আক্রমণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে রোভরাল (প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম) অথবা বাভিস্টিন প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে অথবা ক্যাবরিওটপ প্রতি লিটার পানিতে ৩ গ্রাম হারে ৭-১০ দিন পর পর ৩/৪ বার স্প্রে করে গাছ রোগমুক্ত রাখা যায়।

গোলাপী রোগ (pink disease)

গোলাপী রোগের আক্রমণ তেমন ব্যাপক নয়। আম ছাড়াও কাঁঠাল ও অন্যান্য ফল গাছে রোগটি দেখা যায়। যে সমস্ত আম গাছের ডালাপালা ঘন, রোদের কিরণ ঠিকভাবে ভিতরে পৌঁছাতে পারে না সে সমস্ত গাছে রোগের আক্রমণ বেশি হয়। আক্রমণ মারাত্মক হলে ডাল মরে যেতে পারে।

জীবাণু: *Botryobasidium salmonicolor* নামক ছত্রাক

রোগের লক্ষণ:

রোগের আক্রমণে কাণ্ডের বাকলে কোন কোন জায়গায় গোলাপী রঙের আবরণ দেখা যায়। এ আবরণ আক্রান্ত ডালের চর্তুদিকে বেষ্টন করে থাকে। এ আবরণ হচ্ছে ছত্রাক জালিকার সমষ্টি। যেহেতু উচ্চ তাপমাত্রা এবং বাতাসের আর্দ্রতা রোগের বৃদ্ধিতে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে তাই বর্ষাকালে রোগের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। আক্রমণ বাকল ভেদ করে কাণ্ডের কাঠে প্রবেশ করে। কাণ্ডে আক্রমণ

বেশি হলে পাতা ঝরে পড়ে এবং ডালটি মারা যেতে পারে। বেশি পাতা ঝরে পড়ার কারণে গাছ দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।

আক্রান্ত ডগা

বিস্তার

রোগাক্রান্ত ডালে জীবাণু বেঁচে থাকে। বর্ষাকালে রোগের জীবাণু ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং বাতাসের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে নতুন কাণ্ডে আক্রমণ ঘটায়।

প্রতিকার:

- আক্রান্ত অংশের বাকল চাকু বা ছুরি দ্বারা চেঁছে পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং কাটা অংশে বোর্দো পেষ্টের প্রলেপ দিতে হবে
- ঘন ডালপালাযুক্ত গাছের কিছু ডাল ছাঁটাই করা উচিত যাতে গাছের ভিতর সূর্যের আলো পৌঁছতে পারে।
- রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেনডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (ব্যাভিস্টিন/নোইন) প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে মিশিয়ে ২/৩ বার স্প্রে করতে হবে।

আমের প্রধান ক্ষতিকারক পোকাসমূহ ও তাদের দমন ব্যবস্থাপনা

আম গাছ লাগানোর পর থেকে শুরু করে ফল সংগ্রহ করা পর্যন্ত বিভিন্ন ধরণের পোকার আক্রমণ দেখা যায়। বাণিজ্যিকভাবে আম উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই সকল পোকামাকড় দমন অত্যন্ত জরুরি। আমের আশানুরুপ ফলন না পাওয়ার জন্য পোকা-মাকড়ের আক্রমণ অনেকাংশে দায়ী । পোকা-মাকড়ের আক্রমণে শুধু ফলন কমে যায় তাই নয়, অনেক সময় আমের ফলন শূণ্যের কোঠায়ও পৌঁছতে পারে। সুতরাং আমের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সঠিক সময়ে পোকা দমন অপরিহার্য। আমের প্রধান প্রধান ক্ষতিকারক পোকার পরিচিতি, তাদের ক্ষতির ধরন এবং দমন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল।

আমের শোষক পোকা (Mango hopper)

এ পোকা অন্য সব পোকার চাইতে আমের বেশি ক্ষতি করে থাকে। বাংলাদেশের সর্বত্র এবং সকল জাতে এ পোকা আক্রমণ করে থাকে। সারা বছর আমগাছে এই পোকাগুলি দেখা যায়।

ক্ষতির ধরন:

আম গাছে কচি পাতা বা মুকুল বের হওয়ার সাথে সাথে এগুলি সক্রিয় হয়ে উঠে। এ পোকা নিম্ফ ও পূর্ণবয়স্ক উভয় অবস্থায় আমগাছের সকল কচি অংশ থেকে গাছের রস চুসে খেয়ে বেঁচে থাকে। নিম্ফ গুলি আমের মুকুল থেকে রস চুসে খায় এতে মুকুল শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে ঝরে পড়ে। একটি হপার পোকা দৈনিক তার দেহের ওজনের ২০ গুন পরিমাণ রস শোষন করে খায় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত আঠালো রস মলদ্বার দিয়ে বের করে দেয় যা মধুরস বা হানিডিউ (Honey dew) নামে পরিচিত। এ মধুরস মুকুলের ফুল ও গাছের পাতায় জমা হতে থাকে যার উপর এক প্রকার ছত্রাক জন্মায় (Sooty mould)। এই পোকার আক্রমণে আমের উৎপাদন শতকরা ২০- ১০০ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে। তাছাড়া হপার আক্রান্ত গাছের বৃদ্ধি কমে যায়।

পাতার নীচের পৃষ্টে হপার পোকা

পাতার নীচের পৃষ্টে হপার পোকা

প্রতিকার:

- আম বাগান সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে বিশেষ করে গাছের ডাল যদি খুব ঘন থাকে তবে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ছাঁটাই করতে হবে যাতে গাছের মধ্যে প্রচুর আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে।
- অমের মুকুল যখন ৮/১০ সেন্টিমিটার লম্বা হয় তখন একবার এবং আম মটর দানার মত হলে আর একবার প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক মিশিয়ে সম্পূর্ণ গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে
- আমের হপার পোকার কারণে সুটিমোল্ড রোগের আক্রমণ অনেক সময় ঘটে তাই সুটিমোল্ড দমনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে সালফার জাতীয় ঔষধ কীটনাশকের সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ফল ছিদ্রকারী পোকা (Fruit borer)

আম ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ ১৯৯৫ সাল থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর বিভিন্ন উপজেলায় লক্ষ্য করা যায়। এর পর প্রায় প্রতি বছর এ পোকার আক্রমণ দেখা

গেছে। বর্তমানে আম চাষীদের নিকট এ পোকা একটি অন্যতম সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত।

ফল ছিদ্রকারী পোকায় আক্রান্ত কচি আম

ফল ছিদ্রকারী পোকার লার্ভা

ক্ষতির ধরন:

আম মার্বেল আকারের হলেই এ পোকার আক্রমণ শুরু হয় এবং আম পাকার পূর্ব পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রী পোকা আমের নিচের অংশে ডিম পাড়ে। কয়েকদিনের মধ্যেই ডিম ফুটে কীড়া বের হয় এবং আমের শাঁস খেতে থাকে। পরে আটি পর্যন্ত আক্রমণ করে। আক্রান্ত স্থানটি কাল হয়ে যায়। আক্রান্ত স্থানে জীবাণুর আক্রমণের ফলে পচন ধরে যায়। বেশি আক্রান্ত আম ফেটে যায় এবং গাছ থেকে পড়ে যায়।

প্রতিকার:

- আক্রান্ত আম সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে অর্থাৎ মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে এবং গাছের মরা ডালপালা ছেঁটে ফেলতে হবে। ফলে পোকার আক্রমণ কম হবে।
- আম বাগান নিয়মিত চাষ দিয়ে আগাছা মুক্ত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে
- পোকার আক্রমণ দেখা দেওয়া মাত্র ফেনিট্রোথিয়ন বা ফেনথিয়ন জাতীয় কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে স্প্রে করতে হবে। তাছাড়া কার্বারিল জাতীয় কীটনাশক ২ গ্রাম / লিটার পানিতে দিয়ে স্প্রে করা যায়।

মাছি পোকা (Fruit fly)

মাছি পোকা দ্বারা পরিপক্ক ও পাকা আম আক্রান্ত হয়। ফজলী, ল্যংড়া, খিরসাপাতসহ বিভিন্ন জাতের পরিপক্ক ও পাকা আম গাছে থাকা অবস্থায় এ পোকা আক্রমণ করে।

পূর্ণাঙ্গ মাছি পোকা

মাছি পোকায় আক্রান্ত আম

ক্ষতির ধরন:

স্ত্রী পোকা ডিম পাড়ার অঙ্গের সাহায্যে গাছে থাকা অবস্থায় পরিপক্ক ও পাকা আমের গা চিরে ডিম পাড়ে অর্থাৎ খোসার নিচে ডিম পাড়ে। আক্রান্ত স্থান থেকে অনেক সময় রস বের হয়। বাইরে থেকে দেখে কোনটি আক্রান্ত আম তা বুঝা যায় না। আক্রান্ত পাকা আম কাটলে ভেতরে সাদা রঙ এর কীড়া দেখা যায়। বেশি আক্রান্ত আম অনেক সময় পচে যায়। সাধারণত এ পোকা আমের উপর এবং নিচ উভয় অংশে আক্রমণ করে।

প্রতিকার:

- আম গাছে পাকার আগেই পরিপক্ক অবস্থায় পেড়ে আনা
- আক্রান্ত- আম সংগ্রহ করে মাটির নিচে গভীর গর্ত করে পুতে ফেলতে হবে।
- প্রতি ১০০ গ্রাম পাকা আমের রসের সাথে .৫ গ্রাম সেভিন মিশিয়ে বিষটোপ বানিয়ে এ বিষ টোপ বাগানে রেখে মাছিপোকা দমন করা যেতে পারে।
- আম পরিপক্ক ও পাকার মৌসুমে আমবাগানে ব্লিচিং পাউডার প্রতি লিটার পানিতে ৫ গ্রাম হারে স্প্রে করতে হবে
- আম পরিপক্ক ও পাকার মৌসুমে প্রতিটি আম কাগজ (ব্রাউন পেপার) দ্বারা মুড়িয়ে দিলে আমকে পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যাবে
- ফেরোমনের ফাঁদও (মিথাইল ইউজেনল) ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে প্রচুর পুরুষ পোকা মারা যাবে এবং বাগানে মাছি পোকার আক্রমণ কমে যাবে।

কাণ্ডের মাজরা পোকা (Stem borer)

বাংলাদেশের সর্বত্রই কমবেশি এ পোকার আক্রমণ দেখা যায় এবং খুব কম সংখ্যক গাছে আক্রমণ দেখা যায়।। তবে অনেক সময় সিরিয়াস পেস্ট হিসেবেও দেখা যায়।

পূর্ণাঙ্গ কাণ্ডের মাজরা পোকা

কাণ্ডের মাজরা পোকার লার্ভা

ক্ষতির ধরন:

এ পোকা আম গাছের কাণ্ড ও শাখাকে আক্রমণ করে। আক্রমণ স্থান দিয়ে পোকার মল নির্গত হয়। ছোট গাছ আক্রান্ত হলে গাছ মারা যেতে পারে। আক্রান্ত শাখাগুলি সহজেই ভেঙ্গে যায়।

প্রতিকার:

- গাছের কাণ্ড বা শাখায় কোন ছিদ্র দেখা গেলে ঐ ছিদ্র পথে সূঁচালো লোহার শিক বা সাইকেলের স্পোক ঢুকিয়ে পোকাটির কীড়াকে খুঁচিয়ে মেরে ফেলতে হবে।
- ছিদ্রটি ভালভাবে পরিষ্কার করে তার মধ্যে কেরোসিন বা পেট্রোল ভিজানো তুলা ঢুকিয়ে ছিদ্রের মুখ কাদা দিয়ে ভালবাবে বন্ধ করে দিতে হবে।

পাতা কাঁটা উইভিল (Leaf cutting weevil)

নার্সারিতে চারা গাছের কচি পাতায় এই পোকার আক্রমণ বেশি দেখা যায়। তাছাড়া অনেক সময় বড় আম গাছের কচি পাতা কাটতেও দেখা যায়। এ পোকা সাধারণত আম ছাড়া অন্য কোন গাছের ক্ষতি করে না।

ক্ষতির ধরন:

কচি পাতার বোঁটার কাছাকাছি এভাবে কেটে দেয়

এ পোকা আম গাছের শুধু কচি পাতা কেটে ক্ষতি করে। কচি পাতার নিচের পিঠে মধ্যশিরার উভয় পাশে স্ত্রী পোকা ডিম পাড়ে এবং পরে পাতাটির বোঁটার কাছাকাছি কেটে দেয়। ভালো করে দেখলে কেঁচি দ্বারা কেউ কেটেছে বলে মনে হয়।এ পোকার আক্রমণে গাছের নতুন পাতা ধ্বংস হয়। বেশি আক্রমণে একটি ছোট গাছ পাতাশূণ্য হতে পারে।

প্রতিকার:

- নতুনকাটা পাতা মাটি থেকে সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- গাছে কচি পাতা বের হওয়ার সংগে সংগে ফেনিট্রোথিয়ন বা ফেনথিয়ন জাতীয় কীটনাশক ২ মিলি/ লিটার পানিতে স্প্রে করলে পোকার আক্রমণ রোধ করা যায়। তাছাড়া কার্বারিল জাতীয় কীটনাশক ২ গ্রাম/লিটার পানিতে স্প্রে করলেও পোকার আক্রমন রোধ করা যায়।

পাতার গল মাছি (Leaf gall midge)

ক্ষতির ধরন:

গল আক্রান্ত পাতা

কয়েক প্রকারের গল সৃষ্টিকারী পোকা আম গাছের কচি পাতায় আক্রমণ করে তাতে বিভিন্ন আকারের গল রোগের সৃষ্টি করে। পাতার উপর কিংবা নিচের পৃষ্ঠে কিংবা উভয় পৃষ্ঠে গল দেখা যায়। গল গুলি বিভিন্ন রঙের যেমন- ধুসর, বাদামী, সবুজ, লাল ইত্যাদি। স্ত্রী পোকা আমের কচি পাতার নিচের দিকে ছিদ্র করে ডিম পাড়ে। ৩-৪ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে ম্যাগোট বা বাচ্চা পোকা বের হয় । পরে পাতার কোষ এবং টিস্যুসমূহে প্রবেশ করে রস খাওয়ার কারণে পাতায় গলের সৃষ্টি হয়। পাতায় গলের পরিমাণ বেশি হলে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে। অনেক সময় গাছের পাতা শুকিয়ে মারা যেতে পারে।

প্রতিকার:

- আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে
- ঘনভাবে রোপণকৃত আম বাগানে ছায়া থাকে বিধায় আম গাছের পাতায় গলের আক্রমণ বেশি হয় । এজন্য আম পাড়ার পরে কিছু ডালপালা ছাঁটাই করা ভাল
- ডাইমিথয়েট জাতীয় কীটনাশক ২ মিলি/ লিটার পানিতে দিয়ে স্প্রে করলে আমের পাতায় গল মাছি দমন করা যায়।

এপসিলা পোকা (Shoot-gall psyllid)

এপসিলা আমের একটি মারাত্মক ক্ষতিকর পোকা। বর্তমানে এ পোকার আক্রমণ তেমন একটা দেখা যায় না। তবে এপসিলা পোকার আক্রমণ হঠাৎ করে কোথাও কোথাও অল্প করে হলেও দেখা যায়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় এটি তাবিজ পোকা নামে অনেকের নিকট পরিচিত।

ক্ষতির ধরন:

এপসিলা পোকা আক্রান্ত পাতা

কচি পাতায় পাড়া ডিমের ভিতর ভ্রুণাবস্থায় থাকা প্রথম ধাপের নিম্ফ পাতার ভিতর থেকে রস চুসে খায় এবং এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত করে যার কারণে পত্রকক্ষে সুচালো মুখবিশিষ্ট সবুজ রঙের মোচাকৃতি গলের সৃষ্টি হয়। এই গল সৃষ্টি

হওয়ার কারণে পত্রকক্ষে আর কোন নতুন পাতা বা মুকুল বের হতে পারে না। গাছে বেশি পরিমাণে গল সৃষ্টি হলে গলযুক্ত ডগা শুকিয়ে যায় এবং গাছের বৃদ্ধি কমে যায় ও সেই সাথে আমের ফলন কমে যায়।

প্রতিকার:

- অক্টোবর-নভেম্বর মাসে সমস্ত আম গাছ থেকে নিস্ফসহ গল (তাবিজ) সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে
- মার্চ-এপ্রিল মাসে আম গাছের পাতায় ত্রপসিলা পোকার ডিম পাড়ার চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেলে প্রতিলিটার পানির সাথে ডাইমিথয়েট জাতীয় কীটনাশক ২মিলি/ লিটার হারে মিশিয়ে পাতা ও ডালপালা ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।

টপ ওয়ার্কিং এর মাধ্যমে আমের জাত পরিবর্তন

টপ ওয়ার্কিং কি ?

টপ ওয়ার্কিং হলো আমের জাত পরিবর্তনের একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। অর্থাৎ এই পদ্ধতির মাধ্যমে অনুন্নত বা অপছন্দনীয় জাতের আম গাছকে সমূলে উৎপাটন না করে তাতে কাঙ্খিত বা উন্নত জাতের সায়ন বা ডাল সংযোজন করে নতুন জাতে রূপান্তর করা যায়।

টপ ওয়ার্কিং এর প্রয়োজনীয়তা

দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য গুটি জাতের আমগাছ। ভাল বা উন্নতজাতের আমের চাহিদা দেশব্যাপী। বর্তমানে দেশের সকল জেলাতেই আমের চাষাবাদ হচ্ছে। কিন্তু ভাল ও মানসম্পন্ন আম সকল জেলাতে উৎপাদন হয় না। কারণ হিসেবে দেখা যায়, মাটি ও আবহাওয়াগত অবস্থা, আমের জাত ও বাগান ব্যবস্থাপনা উল্লেখযোগ্য। চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, দিনাজপুর, মেহেরপুর ও ঠাকুরগাঁ জেলাতে ভাল জাতের আম উৎপাদন হয়ে থাকে। অন্যান্য জেলাগুলোতে বেশিরভাগ আমগাছ বীজ থেকে হওয়া বা গুটি প্রকৃতির। সাধারণত দেখা যায় পছন্দের আমটি মানুষ খেয়ে আঁটিটি ফেলে দেয় আশেপাশের ফাঁকা জায়গায়। সপ্তাহ দুই-তিনের মধ্যেই সেখান থেকে জন্ম নেয় সুন্দর একটি চারাগাছ। তখন মানুষ চিন্তা করে যে সেই সুস্বাদু আমের বীজ থেকে একই ধরনের আম পাওয়া যাবে। মাঝে চলে যায় ৫-৭টি বছর। প্রকৃতপক্ষে বীজের গাছ হতে ভাল জাতের আম পাওয়া সম্ভব নয়। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, প্রতি বছর বিভিন্ন বয়সের আমগাছ চাষীরা কেঁটে ফেলেন এবং সেই স্থানে পুনরায় নতুন ও কাঙ্খিত জাতের চারা/কলম লাগান। কিন্তু অতি সহজেই টপ ওয়ার্কিং এর মাধ্যমে অনুন্নত জাতকে উন্নত জাতে পরিবর্তন করা যায়। অর্থাৎ গুটি আমের গাছকে উন্নত (ল্যাংড়া, খিরসাপাত, গোপালভোগ ইত্যাদি) জাতে রূপান্তর। এছাড়াও ভাল জাতের আমের

চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় ৪০ ভাগ আম গাছই গুটি প্রকৃতির। যদি এই গুটি গাছগুলোকে এই পদ্ধতির মাধ্যমে উন্নত জাতে পরিবর্তন করা সম্ভব হয় তাহলে খুব অল্প সময়ে দেশে আমের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে। অনেকে অনুন্নত জাতের আম গাছকে কেঁটে ফেলেন এবং ঐ স্থানে নতুন করে গাছ লাগিয়ে থাকেন। ফলে সময় ও শ্রমের অপচয় হয়।

কখন ও কিভাবে টপ ওয়ার্কিং করা হয়

এই পদ্ধতিতে জাত পরিবর্তনের জন্য প্রথমে অনুন্নত বা গুটি জাতের গাছটির উপরের অংশ কর্তন করা হয়। বছরের সব সময় এই কর্তনের কাজটি করলে সুফল পাওয়া যাবে না। বরং বিভিন্ন ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। যেমন নতুন কুশি বা ডগা ঠিকমত বের না হওয়া, রোগ ও পোকার আক্রমণ। গবেষণায় দেখা গেছে, শীতের শেষে বা ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে এবং সেপ্টেম্বর মাসে কর্তনের কাজটি করলে ভাল হয়। সাধারণত হাতের মতো মোটা (১৫-২০ সেমি পরিধির) ডাল ছাঁটাই করা উত্তম

তবে কর্তিত গাছকে একটি ভাল অবয়ব দেওয়ার জন্য এর চেয়ে মোটা ডালও কর্তন করা যায়। ডাল ছাঁটায়ের পর পরই কাঁটাস্থানে বোর্দোপেষ্টের প্রলেপ দিতে হবে যাতে কাঁটাস্থানে রোগের জীবাণুর আক্রমণ না ঘটতে পারে। গাছ কর্তনের পরে গাছে অবশ্যই সার ও সেচ ব্যবস্থাপনা করতে হবে। সাধারণত দেখা যায়, ডাল কর্তনের ১৫-৩০ দিন পর নতুন শাখা বা কুশি বের হয়। তবে মাটির অবস্থাভেদে এই সময় কম বেশি হতে পারে। প্রথমে দেখা যায়, কর্তিত অংশ হতে অসংখ্য নতুন কুশি বের হয়। সুস্থ সবল ও রোগমুক্ত শাখাগুলো রেখে বাকি গুলো ভেঙ্গে ফেলতে হবে। গাছের বয়স অনুযায়ী ৫০-১০০টি শাখা রাখতে হবে। চিত্রে টপ ওর্য়াকিং পদ্ধতি ব্যবহার করে জাত পরিবর্তন দেখানো হয়েছে (A, B, C, D) এই সময় নতুন কুশিতে এ্যানথ্র্যাকনোজ রোগের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এই রোগের আক্রমণ দেখা দিলে ছত্রাকনাশক নির্দেশিত মাত্রায় ২/৩ বার ১৫ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে। পাতা কাটা উইভিল বা থ্রিপস এর আক্রমণ হলে সুমিথিয়ন ৫০ ইসি/ ডায়াজিনন ৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে স্প্রে করতে হবে। ছাঁটাইকৃত ডালে যে কুশি বের হবে সেগুলো মে-জুলাই মাস পর্যন্ত কলম করা যাবে। ক্রেফ্‌ট

এবং ভিনিয়ার এই দুই পদ্ধতিতে কলম করা যায়। তবে কলম করার সময় ভিনিয়ার পদ্ধতিতে কলম করা উত্তম। অন্য পদ্ধতিতে সফলতার হার কম হবে। প্রত্যেকটি ডালে ভিন্ন জাত দ্বারা কলম করা সম্ভব তবে খুব বেশি জাতের কলম না করা ভাল। কলম করার পর মূল গাছের অর্থাৎ অনুন্নত জাতের শাখা-প্রশাখা বের হলে তা ভেঙ্গে ফেলতে হবে। নতুন জাতে পরিবর্তিত গাছে তৃতীয় বছর হতে আম উৎপাদন শুরু হয় এবং চতুর্থ বছর হতে ভাল ফলন দিতে শুরু করে। গবষণার ফলাফল হতে দেখা গেছে ৮-১০ বছরের গাছে জাত পরিবর্তন করা সবচেয়ে ভাল। তবে গাছের বয়স ৪০-৪৫ বছর হলেও পদ্ধতিটি প্রয়োগ করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে। গাছের বয়স কম হলে ডগা না কেঁটে সঠিক সময়ে সরাসরি কলম বাধার মাধ্যমে জাত পরিবর্তন করা যায়।

টিপ প্রুনিং প্রযুক্তির মাধ্যমে আমের ফলন ও গুণগতমান বৃদ্ধির প্রযুক্তি

টিপ প্রুনিং কি?

সাধারণভাবে প্রুনিং বলতে আমরা অংগ ছাঁটাইকরণকে বুঝে থাকি। আর টিপ প্রুনিং বলতে গাছের অগ্রভাগ কর্তনকে বুঝানো হয়। এর মাধ্যমে ফলের আকার ও গুণগত মান ভাল করা যায়। প্রায় দুই দশক ধরে আমাদের দেশে বারি আম-৩ তথা আম্রপালি জাতটি চাষ হয়ে আসছে। সকলের পছন্দনীয় হওয়ায় এ জাতটির চাষাবাদ দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমান সময়ে বিভিন্ন স্থানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই জাতের আমের আকার দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন কারণে আমের আকার ছোট হতে পারে। আমের আকার ছোট হলে আমের চাহিদা ও গুণগত মান কমে যায় ফলে আমের বাজার মূল্যেও কমে যায়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ দীর্ঘদিন যাবৎ আমের নতুন জাত উদ্ভাবন, উন্নত বাগান ব্যবস্থাপনা, রোগ-বালাই দমন, এবং উদ্ভাবিত জাতগুলোর আশানুরূপ ফলন প্রাপ্তির জন্য বহুমুখী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় উদ্ভাবিত হয়েছে আরও নতুন একটি

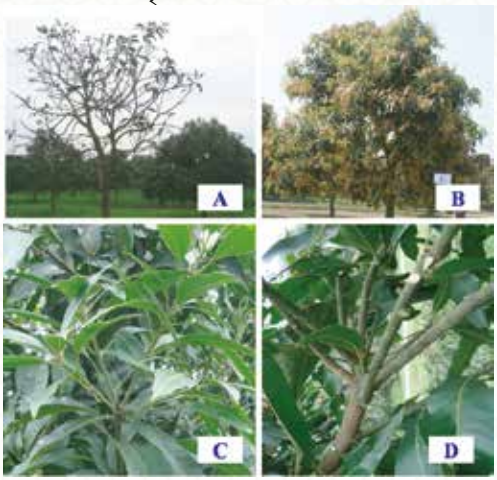

প্রযুক্তি। সেটি হলো আম গাছের টিপ প্রুনিং বা অগ্রভাগ কর্তন। অন্যান্য ফলের সাথে প্রুনিং বা অগ্রভাগ কর্তন বিষয়টি পরিচিত হলেও আমের ক্ষেত্রে এটি সম্পুর্ণ নতুন প্রযুক্তি। তবে পৃথিবীর অন্যান্য আম উৎপাদনকারী ও রপ্তানীকারক দেশে গুণগত মানসম্পন্ন আম উৎপাদনে এই ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার হয়ে আসছে। বর্তমানে এদেশে আম চাষাবাদের এলাকা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে বাড়ছে উৎপাদন এবং সুযোগ তৈরি হচ্ছে নতুন কর্মস্থালের। ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে বাড়ির ছাদ হতে শুরু করে বড় বড় বাগান পর্যন্ত গড়ে উঠেছে। এদেশের মানুষ বাড়ির আশে পাশে, ছাদে যে আমের জাতটি সবচেয়ে বেশি চাষ করে থাকেন সেটি হলো বারি আম-৩ বা আম্রপালি। কেউ কেউ জাতটি চাষ করেছেন টবে এবং ড্রামে। এছাড়াও পার্বত্যজেলাগুলোতে যেমন চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে এই জাতটি ব্যপক চাষাবাদ হচ্ছে। ঐ সকল স্থানে বারি আম-৩ বা আম্রপালি জাতটি ছোট হওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। আম ছোট হওয়ার কারণ অনুসন্ধানে দেখা গেছে, গাছে প্রচুর আম ধরলে, গাছকে পর্যাপ্ত খাবার না দিলে, সঠিক দূরত্বে আমের চারা বা কলম না রোপণ করলে এবং গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে আমের আকার ছোট হতে থাকে। ফলে বর্তমানে জাতটির বাজার মুল্যে ও চাহিদা দিন দিন কমে আসছে। আম বিজ্ঞানীরা এই সমস্যাটি নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করে এর একটি সুন্দর ও পরিবেশবান্ধব সমাধান দিতে সক্ষম হয়েছেন। আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষনা কেন্দ্র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর ফল বিজ্ঞানীরা বারি আম-৩ জাতের উপর গবেষণা কাজটি পরিচালনা করেছেন। গবেষণায় ফলাফল হতে দেখা গেছে, আম সংগ্রহ করার পর পরই অথবা জুলাই মাসে আম গাছের প্রত্যেকটি ডগার শীর্ষ প্রান্ত হতে ৩০ সেমি বা ১ ফুট পর্যন্ত কেঁটে দিলে পরবর্তী বছরে ঐ গাছ হতে বড় আকারের ও গুণগত মানসম্পন্ন আম পাওয়া যাবে (চিত্র-A)। তবে গবেষণার ফলাফল হতে দেখা গেছে, জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে প্রুনিং করা উত্তম। ফলন বাড়ার কারণ হিসেবে দেখা গেছে, কর্তিত অংশ হতে ৩-৭টি নতুন ডগা বের হয় (চিত্র- C & D) এবং নতুন শাখার বয়স ৫-৬ মাস হওয়ায় প্রায় প্রত্যেকটি শাখায় মুকুল আসে। তবে কর্তিত অংশের পরিমাণ বেশি হলে এবং আগস্ট মাসের পরে ডাল কাঁটলে পরের মৌসুমে এ জাতটিতে মুকুল নাও আসতে পারে। বর্তমানে এই জাতটির ওজন স্থানভেদে ৬০-১৮০ গ্রাম পর্যন্ত হতে

দেখা যাচ্ছে কিন্তু নতুন এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমের ওজন ২৫০-৪০০ গ্রাম পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। চিত্রে প্রযুক্তিটি প্রয়োগ করে আমের আকার বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে।

আমের আকার বড় হওয়ায় চাহিদা ও বাজারমূল্য বৃদ্ধি পাবে। আমগাছের বয়স ৫ বছর হলে এই প্রযুক্তিটি ব্যবহার করা যাবে এবং ৪০ বছর পর্যন্ত ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে। প্রুনিং প্রতি ৫ বছরে একবার করলেই চলবে। এই প্রযুক্তিটি ব্যবহারের জন্য বারি আম-৩ বা আম্রপালি জাতটি নির্বাচন করতে হবে।

প্রযুক্তিটির অন্যান্য সুবিধাসমূহ

- আমের আকার ও গুণগত মান বাড়ানো সম্ভব ফলে আমের ফলন বৃদ্ধি পাবে।
- পাতার লাল মরিচা রোগ এই জাতের একটি বড় সমস্যা। কোন প্রকার ছত্রাকনাশক স্প্রে ছাড়াই প্রায় দুই বছর পর্যন্ত রোগটি সহজেই দমন করা যায়।
- আমবাগানে ২৫-৩০ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন ফসল অনায়াসে সাথী ফসল হিসেবে চাষাবাদ করা যাবে
- কোন প্রকার কীটনাশক ব্যবহার ছাড়াই ভাল ফলন পাওয়া যাবে।
- বর্তমানে ঘন করে গাছ রোপণ করে যারা কাঙ্খিত ফলন পাচ্ছেন না সেক্ষেত্রে এই প্রযুক্তিটি সহায়ক হবে।
- আমগাছের আকার ছোট রাখা যায় অর্থাৎ সুন্দর ক্যানোপি তৈরি করা যায় ফলে বাগান ব্যবস্থাপনা সহজ হয়।
- ছাঁটাইকৃত ডালপালা জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা যাবে

রপ্তানীযোগ্য আমের উৎপাদন বৃদ্ধিতে করণীয় ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশের আম মান ও গুণে উচ্চ মানসম্পন্ন, বিদেশে আছে যার ব্যাপক চাহিদা। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। এ ক্ষেত্রে কিছু বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

- দেশে আমের উৎপাদন বৃদ্ধি
- আমের তালিকায় নতুন উন্নত জাতের সংযোজন
- বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের আমের পরিচিতি বাড়ানো
- বিদেশের বাজারে লেন-দেন ক্ষমতা ও সুনাম বৃদ্ধি

আম রপ্তানীর সমস্যা:

বিশ্বের প্রধান দশটি আম উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অষ্টম (এফ এ ও-২০১১) স্থানে থাকলেও আম রপ্তানীকারক দেশ হিসাবে কোন অবস্থানে নেয় (সি আই এ ওয়ার্ল্ডবুক-২০১১)। কারণ রপ্তানীযোগ্য আমের কিছু

শর্ত ও বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক যেমন- প্রতিটি আম রোগের জীবাণু, পোকামাকড়, হেভি মেটাল ও দাগ মুক্ত হওয়া। তাছাড়া আমের ওজন ২০০-৩৫০ গ্রাম, চামড়া রঙিন, শাঁস দৃঢ় ও অল্প মিষ্টতা থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দেশীয় আমে উপরোক্ত বিষয় গুলির অনেকটা অভাব পরিলক্ষিত হয় বিধায় সেই আমগুলোকে বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভবপর হয় না। তাছাড়া আম রপ্তানির সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সমস্যা গুলো নিম্নরূপ-

- প্রাকৃতিক দুর্যোগ
- আমের প্রাপ্তিকাল খুবই সীমিত
- হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট এর সুবিধা না থাকা । ফলে আম উজ্জ্বল, বেশিদিন স্থায়ী হওয়ার পাশাপাশি ফ্রুটফ্লাই মুক্ত করা যায় না
- আম পাকানো ও সংরক্ষণকাল বৃদ্ধিতে ক্ষতিকর রাসায়নিক বস্তুর ব্যবহার
- সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা যেমন- প্যাকেজিং ও পরিবহন সন্তোষজনক নয়
- কৃষক ও রপ্তানিকারকগণের সম্পর্ক না থাকা এবং এ ব্যাপারে কোন তথ্য না জানা
- বিদেশি আমদানীকারকদের আমাদের দেশ সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত না থাকা
- গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম যথেষ্ট শক্তিশালী না হওয়া
- কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ড না জানা
- ফাইটো সেনিটারি সার্টিফিকেট সহজলভ্য নয়
- এয়ার কার্গো কম এবং
- সরকারি সহযোগিতা, নীতিমালা ও লোন পর্যাপ্ত নয়।

রপ্তানীযোগ্য আমের উৎপাদন বৃদ্ধিতে করণীয়:

বাংলাদেশে উৎপাদিত ৯.৫ লক্ষ মেট্রিক টন আমের বেশির ভাগই দেশের ক্রেতাগণ ক্রয় করে থাকেন। বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে সীমিত পরিমাণে আম বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে ল্যাংড়া, ফজলী, হিমসাগর এবং আশ্বিনা জাতের আম রপ্তানী হয়ে থাকে। বারি আম-২ এবং বারি আম-৭ বিদেশে রপ্তানীর জন্য সম্ভাবনাময় জাত। ল্যাংড়া, খিরসাপাত ও বারি আম-৩ Wal Mart এর চাহিদার তালিকায় রয়েছে। বাংলাদেশ থেকে আম আমদানীকারক দেশগুলো হচ্ছে যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ইটালী, সৌদিআরব, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ওমান। তবে উল্লেখিত দেশের প্রবাসী বাংলাদেশীরাই প্রধানত এ সকল আমের প্রধান ক্রেতা। উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি ও পরিচর্যার মাধ্যমে রপ্তানীর উপযোগী আমের উৎপাদন বৃদ্ধি করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এতে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

রপ্তানীযোগ্য আমের উৎপাদন বৃদ্ধিতে করণীয় বিষয় গুলো নিম্নরূপ-

- সার ও সেচ প্রয়োগ এবং রোগ বালাই দমনে আধুনিক কলাকৌশল অর্থাৎ সঠিক সময়ে, সঠিক মাত্রায় ও সঠিক পদ্ধিতে সার, সেচ ও বালাইনাশক ব্যবহারের মধ্যেমে আমের অধিক ফলন নিশ্চিত করা। এ ব্যাপারে কৃষি গবেষণার সঙ্গে সমন্বয় করে আম চাষীদের/ব্যবসায়ীদের উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সঠিক পরিমাণ রাসায়নিক সার ব্যবহারের পাশাপাশি বেশি বেশি করে জৈব সারের ব্যবহার বাড়ানো অর্থাৎ জৈব প্রযুক্তি নির্ভর আম উৎপাদনে উৎসাহিত করা।
- চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্রগ্রাম ও সিলেট জেলায় আম চাষ বাড়ানো দরকার। তাছাড়া রাস্তার দু' ধারে এবং স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে আম গাছ লাগাতে হবে।
- আগে থেকে জন্মানো গুটি আমের গাছ গুলিকে না কেটে টপ-ওয়ার্কিং এর মাধ্যমে ভাল জাতে পরিবর্তন করে আমের উৎপাদন বাড়ানো।
- সরকারি ও বিএডিসি এর উদ্যান নার্সারি গুলোকে আরও উন্নত মানের এবং ভাল জাতের চারা কলম সরবরাহ বাড়াতে হবে।
- আমের প্রাপ্তিকাল বাড়াতে হবে যাতে করে দীর্ঘ সময় ধরে আম পাওয়া যায়।
- আম পাকানো ও সংরক্ষণকাল বৃদ্ধিতে ক্ষতিকর রাসায়নিক বস্তুর ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।
- হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট এর সুবিধা থাকা। এতে আম উজ্জ্বল, বেশি দিন স্থায়ী হওয়ার পাশাপাশি ফ্রুটফ্লাই মুক্ত হবে।
- আম সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্যাকিং ও পরিবহন বিষয়ে উন্নত প্রশিক্ষণ দেয়া।
- রপ্তানীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আম উৎপাদনকারী, আম সরবরাহকারী এবং আম রপ্তানীকারকদের সরকারি সহযোগিতা প্রদান করা, তাদের নিবন্ধন করা ও সমিতির আওতায় এনে সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন।
- স্থিতিশীল বাজার ব্যবস্থাপনা থাকা দরকার। এ ব্যাপারে জনগণ ও সরকারকে সমান দায়িত্ব নিতে হবে। বিদেশে অনেক দেশে আম চাষী সমিতি আছে- এ সমিতিই বাজার নিয়ন্ত্রণ করে যাতে করে কোন চাষী ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।
- আম ব্যবসায়ীদের বিদেশ ভ্রমণের মাধ্যমে আমের আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি করতে হবে।
- আম সংরক্ষণের জন্য কোল্ড স্টোরেজ তৈরি, হিমায়িত পরিবহন, দ্রুত স্থানান্তরকরণ, বাছাই, প্যাকেজিং এবং গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- সমবায় ভিত্তিতে আম সংরক্ষণ স্থাপনার ব্যবস্থা করা।
- গবেষণা করে বিদেশিদের চাহিদা অনুযায়ী জাত উদ্ভাবন করা।
- বিদেশ থেকে আম আমদানি নিরুৎসাহিত করতে হবে।

আমবাগানে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের প্রভাব

এদেশে আম চাষাবাদের এলাকা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সাথে দেখা দিয়েছে নতুন নতুন সমস্যা। সময়ের পরিবর্তনে এখন অনেক আম ব্যবসায়ী আমগাছে নিয়মিত কালটার বা প্যাকলোবিউট্রাজল ব্যবহার করছেন। গত কয়েক বছর আগে থেকেই কালটারসহ বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার হয়ে আসছে। সেই সময়ে হাতে গণা কিছু অসাধু আম ব্যবসায়ী অত্যন্ত গোপনে এটি ব্যবহার করতো। এটি আসলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক বা নিরোধক হিসেবে কাজ করে। এটি তরল ও পাউডার উভয় অবস্থাতে পাওয়া যায়। দেশ ও কোম্পানিভেদে এটি বিভিন্ন নামে বাজারজাত করা হয়। বর্তমান সময়ে যোগ হয়েছে আমে ফরমালিনের প্রয়োগ। আসলে নির্দিষ্ট মাত্রায় কীটনাশক, ছত্রাকনাশক ও হরমোন ব্যবহার করা দোষের কিছু নয় কিন্তু এগুলোর মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার কাঙ্খিত নয়।

প্রকৃতপক্ষে আমে ফরমালিন ব্যবহারের তেমন যোক্তিকতা নেই বললেই চলে। শুধুমাত্র একটু লাভের আশায় মুলত খুচরা আম ব্যবসায়ীরা এর ব্যবহার করছেন। শীঘ্রই এর ব্যবহার সীমীত করতে হবে। প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন এবং প্রশিক্ষিত গাইড ছাড়া কোনভাবেই এর ব্যবহার করা যাবে না। প্রয়োজনে ব্যবহার সম্পর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে।

ফল-ফসলের উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে ক্ষতিকর রাসায়নিক বা কীটনাশকের ব্যবহার নতুন কোন বিষয় নয়। তবে বর্তমানে বিভিন্ন ফসলে বিভিন্ন পর্যায়ে কীটনাশকের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শাক-সবজি হতে শুরু করে ফল-মুলেও স্প্রের পরিমাণ উদ্বেগকজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে এদেশে যে ৭০টি ফল বাণিজ্যিকভাবে চাষ হচ্ছে আম তাদের মধ্যে অন্যতম। এ দেশে যে পরিমাণ জমিতে ফলের চাষ হয় তার প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ জমিতেই আম চাষাবাদ হয়। আমের বহুবিধ ব্যবহারের কারণে ছোট বড় সকলের নিকট আম পছন্দের একটি ফল। বিভিন্ন রাসায়নিক ও বালইনাশকের ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকার জন্য আমচাষীরা কারণে- অকারণে এক মৌসুমে আমবাগানে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ এবং বহুবার কীটনাশক ও ছত্রাকনাশকের স্প্রে করে থাকেন ফলে আমবাগানে প্রতিবছর নতুন নতুন সমস্যা দেখা যাচ্ছে। অসাধু কিছু আম ব্যবসায়ীর অতিউৎসাহের কারণেই বিভিন্ন সমস্যা দেখা যাচ্ছে। বর্তমান সময়ে আমবাগানে অজানা রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার সবাইকে ভাবিয়ে তুলছে। অতিমাত্রায় ক্ষতিকর বালাই-নাশকের ব্যবহার মানব স্বাস্থ্যের বিভিন্ন রোগের জন্য দায়ী। এর সাথে বর্তমানে যোগ হয়েছে কালটার বা

প্যাকলোবিউট্রাজল (Paclobutrazol) এবং নামক রাসায়নিকের ব্যবহার। গত কয়েক বছর যাবৎ এই রাসায়নিকের ব্যবহারের অপতৎপরতা দেখা যাচ্ছে। চোরাই পথে এদেশে আসা এই রাসায়নিকটি বাগান মালিকের অজান্তে আম ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করছেন। আমবাগান মালিক বিভিন্ন মেয়াদে (১-২০ বছর পর্যন্ত) বাগান বিক্রি করে থাকেন। ফলে নতুন মালিক চান কিভাবে বাগান হতে অধিক মুনাফা পাওয়া যায়। সুতরাং বাগান ব্যবসায়ীরা আমগাছের কথা চিন্তা না করে বিভিন্ন রাসায়নিকের ব্যবহার করেন এবং প্রথম, দ্বিতীয় বছর ভাল ফলন পেয়ে থাকেন। কিন্তু পরবর্তী বছর গুলোতে আমগাছের বিভিন্ন সমস্যা দেখা যায়। যেমন-

- গাছের নতুন ডগা খাটো হয়ে যায় এবং গাছের পাতার আকার ছোট হয়
- গাছের আকার-আকৃতি রোগাক্রান্ত অথবা প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি রয়েছে এ রকম গাছের মতো হয়
- গাছের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে যায় ও বিভিন্ন পোকার আক্রমণ দেখা যায় যায়
- আগাম ফুল আসার প্রবণতা দেখা যায়
- ফলের আকৃতি ছোট হয়, ওজন কমে যায়

স্বল্পকালিন পরিচর্যা দ্বারা এর সমাধান দেওয়া সম্ভব নয়। তবে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে গাছগুলোকে সারিয়ে তোলা সম্ভব। কালটার প্রয়োগকৃত বাগানে অধিক পরিমাণে জৈবসার যেমন গোবর সার অথবা আবর্জনা পচা সার প্রয়োগ করতে হবে। স্বাভাবিক প্রয়োগমাত্রার দেড়-দুইগুন সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে এবং নিয়মিত সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অসুস্থ গাছগুলোকে পুনরায় ফলন্ত গাছে রূপান্তর করা যায়। তবে সবচেয়ে বড় প্রতিকার হলো আমগাছে নতুনভাবে কালটার ব্যবহার না করা, আরেকটি উপায় হলো দেশে যেহেতু বৈধভাবে এর ক্রয়-বিক্রয় হয় না, সেক্ষেত্রে অবৈধভাবে চোরাইপথে এর আমদানি বন্ধ/নিষিদ্ধ করতে হবে। পৃথিবীর অন্যান্য আম উৎপাদনকারী দেশে কালটারের ব্যবহার হচ্ছে কিন্তু সেক্ষেত্রে অবশ্যই সঠিকমাত্রা, নিয়মনীতি এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানের সরবরাহ নিশ্চিত করে ব্যবহার করা হয়।

আবহাওয়াগত কারণে দেশের উত্তর-পশ্চিমের জেলাগুলোতে আমের আগাম মুকুল কাঙ্খিত নয়। কিন্তু কালটার ব্যবহারের সময় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকার কারণে আমবাগান গুলোতে আগাম মুকুল আসতে দেখা যাচ্ছে। এসব মুকুলে প্রাথমিক অবস্থায় নতুন নতুন পোকার আক্রমণ দেখা যাচ্ছে। ফলে আমচাষীরা পড়ছেন নতুন সমস্যায়। এছাড়াও দেখা যাচ্ছে, কিছু আম ব্যবসায়ী নিয়মনীতির

তোয়াক্কা না করে আমবাগানে বহুবার ও মাত্রাতিরিক্ত বালাই-নাশক ব্যবহার করছেন যা শুধু আমের উৎপাদনকেই ব্যয় বহুল করে না বরং পরিবেশের উপরও বিরূপ প্রভাব ফেলে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, একটি আমের মৌসুমে চাষীরা ৫-৬০ বার পর্যন্ত স্প্রে করে থাকেন। যেখানে গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে ৩-৪ বার স্প্রে করেই ভাল ফলন পাওয়া সম্ভব।

ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তি ও রপ্তানিযোগ্য আমের বাণিজ্যিক উৎপাদন

আমের বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তিটি সবচেয়ে সফল ও সম্ভাবনাময়। গবেষণায় ভাল ফলাফল পাওয়ায় বাংলাদেশের আটটি জেলায় প্রথম বারের মতো এই প্রযুক্তিটি সম্প্রসারিত হয়েছে। যে সকল এলাকায় আম বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ হয় না শুধুমাত্র পারিবারিক চাহিদা পূরণে আম গাছ লাগানো হয়। এই সমস্ত গাছে সময়মত স্প্রে করা হয় না বা সেই ধরনের প্রচলন এখনও ঐ সব এলাকায় চালু হয়নি ফলে প্রতি বছরই তাদের গাছে আম ধরে কিন্তু পোকা ও রোগের কারণে অধিকাংশ আম নষ্ট হয়ে যায়। এদেশের যে সকল এলাকায় বৃষ্টিপাত বেশি হয় এবং দেরীতে পাকে সে সকল আমের জাতগুলো বিবর্ণ বা কালো রঙ ধারণ করতে দেখা যায় এবং মাছি পোকার আক্রমণ দেখা যায়।

ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তি সম্বলিত আম গাছ

এছাড়াও যে সমস্ত বাগানে ঘন করে আম লাগানো হয়েছে এবং বর্তমানে গাছের ভিতরে সূর্যের আলো পৌঁছায় না সে সকল গাছে আমের মাছি পোকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে থাকে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে যত ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কোনটিতেই এই পোকাটি শতভাগ দমন করা সম্ভব নয় বরং আক্রমণের হার কিছুটা কমিয়ে রাখা যায়। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে শতভাগ রোগ ও পোকামাকড় দমন করা যায়। আম রপ্তানির জন্য ভাল মানসম্পন্ন, রঙিন ও রোগ-পোকামাকড়ের আক্রমণ মুক্ত আম প্রয়োজন। কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতিতে এই তিন বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটানো কঠিন। বিভিন্ন আম রপ্তানিকার দেশে বহুল পরিচিত ও ব্যবহৃত পদ্ধতি হচ্ছে ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি দ্বারা ১০০% রোগ ও পোকামাকড় মুক্ত আম উৎপাদন করা সম্ভব। এছাড়াও ব্যাগিং করা আম সংগ্রহের পর ১০-১৪ দিন পর্যন্ত ঘরে রেখে খাওয়া যায়। সেই সাথে রঙিন, ভাল মানসম্পন্ন নিরাপদ আমও পাওয়া যায়। এই প্রযুক্তিটি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করে আম চাষীরা সুফল পেতে পারেন।

প্রতি বছর কীটনাশক ও ছত্রাকনাশকের আমদানি বাবদ খরচ করতে হয় কোটি কোটি ডলার এবং ব্যবহার করা হয় অপকারী পোকাকে মারার জন্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উপকারী ও বন্ধুপোকাগুলোও মারা যায়। ফলে দেখা দিয়েছে পরাগায়ণকারী পোকার ঘাটতি। পর্যাপ্ত ফলধারণ হচ্ছে না অনেক পর পরাগী ফলের। বর্তমান সময়ে আম বাগানে স্প্রের পরিমাণ লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে ক্ষেত্রবিশেষে ১৫-৬২ বার। অথচ ব্যাগিং প্রযুক্তি ব্যবহার করা সম্ভব হলে ৭০-৮০ ভাগ স্প্রে খরচ কমানো সম্ভব।

ফ্রুট ব্যাগ ব্যবহারের নিয়মকানুন

- সঠিক সময়ে (আমের বয়স ৩৫-৫৫ দিন তবে ফজলি ও আশ্বিনা জাতে ৬০-৬৫ দিন) ব্যাগিং করার জন্য সময়মত প্রয়োজনীয় ব্যাগ সংগ্রহ করা এবং প্রয়োজনীয় শ্রমিকের ব্যবস্থা করা। চেয়ার বা টুল সঙ্গে থাকলে ভাল হয়।
- ব্যাগিং করার পূর্বে আমগুলিকে কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক একত্রে মিশিয়ে স্প্রে করা (বিকেল বেলায় ব্যাগিং করতে চাইলে সকাল বেলায় স্প্রে করতে হবে অথবা ব্যাগিং করার কমপক্ষে ৩ ঘন্টা পূর্বে স্প্রে করা আবার স্প্রে করার পরের দিনও ব্যাগিং করা যাবে যদি বৃষ্টিপাত না হয়)
- আম ভেজা অবস্থায় ব্যাগিং করা যাবে না অর্থাৎ রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে করা ভালো।
- দুইটি আম একত্রে থাকলে একসাথে ব্যাগিং করা যাবে তবে বড় জাতের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে ব্যাগিং করতে হবে।

- আমের গায়ে মরা ও শুকনা আম, উপপত্র, মুকুলের অংশবিশেষ লেগে থাকলে বা ব্যাগিং করতে অসুবিধার সৃষ্টি করলে তা পরিষ্কার করতে হবে।
- ব্যাগের উপরের অংশ দুইপাশ হতে ভাঁজ করতে করতে মাঝ বরাবর আসতে হবে। এরপর সংযুক্ত তার দ্বারা ভালভাবে মুড়িয়ে দিতে হবে। কোন অবস্থায় যেন পানি বা অন্যকিছু প্রবেশ করতে না পারে।
- ব্যাগ সংগ্রহ করার সময় হাতে কলমে ব্যাগিং করা দেখে নেওয়া ভাল।
- রঙিন আমের জন্য একস্তর বিশিষ্ট সাদা ব্যাগ এবং যে কোন আমের জন্য দুইস্তর বিশিষ্ট বাদামী রঙের ব্যাগ ব্যবহার করতে হবে। উল্লেখ্য দুইস্তর যুক্ত বাদামী রঙের ব্যাগ যে কোন আমকে রঙিন অর্থাৎ হলুদ করতে পারে।